ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৭ সংখ্যা ।। ৫ পৌষ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২১ ডিসেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

চা-বাগানে সক্রিয় মেয়ে পাচারচক্র

প্রাণপ্রতিম পাল ঃ আলিপুরদুয়ার ।। চা-বাগানবাসীদের অভাবের সুযোগে চা বাগানের আদিবাসী মেয়েদের ভিন্ রাজ্যে পাচার করছে এক শ্রেণীর মাফিয়া চক্র। এই সব মাফিয়াদের হাত যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন মহকুমার বিভিন্ন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারেরা।

রাজ্য সরকারের চরম উদাসীনতায় আলিপুরদুয়ারের চা বাগানগুলির অবস্থা আজ সংকটাপন্ন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি চা

বাগান বন্ধ হয়ে রয়েছে। ধুঁকে ধুঁকে চলছে আরও কয়েকটি চা বাগান। সরকার চা শিল্পের উন্নতির কথা বললেও কার্যত চা বাগানগুলোর কোনও উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। দারিদ্র্য, বেকারত্বের জ্বালা চা বাগানে বসবাসকারী শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ার মহকুমার সংকোশ, কার্ত্তিকা, সারোপাড়া, জয়ন্তী প্রভৃতি চা-বাগান থেকে আদিবাসী মেয়েদের দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে কাজ পাইয়ে দেবার নাম করে দেশের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি করছে এক শ্রেণীর দালাল চক্র। কোনও কোনও সময় পাচার হওয়ার আগেই স্থানীয় পুলিশ ওইসব আদিবাসী মেয়েদের ধরে ফেললেও আসল টিম লিডারকে এখনও ধরতে পারেনি। না পুলিশ। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, বিভিন্ন চা বাগান থেকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তারা গন্তব্যস্থানের দিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হয়। স্বল্প বয়স্কা ওইসব মেয়েদের বাড়িতে বিভিন্নভাবে অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে নিয়ে যায় স্থানীয় কোনও বাগানের সিনিয়র (বড়) দিদি। এই ধরনের সিনিয়র দিদিরা ওইসব মেয়েদের ঠিক জায়গায় দালালের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে মাথাপিছু ২০০০ টাকা করে পেয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার জংশন ও নিউজলপাইগুড়ি থেকে দিল্লীগামী বিভিন্ন ট্রেনে পাচারকারীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দিল্লীর পথে পাড়ি দেয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পাওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে পাচারকারীদের গ্রেপ্তার করেও ছেড়ে দিতে হয় পুলিশকে। আলিপুরদুয়ার মহকুমার কুমারগ্রামদুয়ার ব্লক ও আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লকের চা বাগান সহ বিভিন্ন বস্তি থেকে পুলিশ প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে চা বাগানের সহজ-সরল মেয়েরা দেশের বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। ওই মেয়েদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিতে পারলে মাথা পিছু তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত বক্শিস দালালরা পেয়ে থাকে। পাচার হয়ে যাওয়া কম বয়সী মেয়েদের বাড়িতে দালালরা প্রতি মাসে টাকা পাঠায়। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ওই সমস্ত দরিদ্র পরিবারগুলি তাদের মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সমস্যা শুরু হয় প্রতি মাসে বাড়ীতে টাকা আসা বন্ধ হলে। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে নিকটবর্তী থানাগুলিতে গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরী করেন ভিন রাজ্যে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের পরিবারের লোকেরা। ফলে সমস্যায় পড়তে হয় পুলিশ-প্রশাসনকে। গত তিন মাসে এই দুটি ব্লক থেকে ২৬ জনের বেশী কম বয়সী মেয়ে পাচার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এ ব্যাপারে থানায় কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জমা পড়েনি। শুধু যে নিষিদ্ধ পল্লীতে বিক্রি

(এরপর ৪ পাতায়)

চলতি বছরে রাজ্যে প্রায় দু'হাজার মানুষ খুন

বুদ্ধ প্রশাসন চরম ব্যর্থ

গুরুপুরুষ।। পশ্চিমবঙ্গে চলতি বছরে রাজনৈতিক সংঘর্ষে নিহতের মোট সংখ্যা নিয়ে শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে জোর চাপান উতোর চলছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ সম্প্রতি একটি তিন সদস্যের কেন্দ্রীয় টিম কলকাতায় পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। টিমের সদস্যদের দায়িত্ব ছিল রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সরেজমিন যাচাই করে রিপোর্ট দেওয়া। বলাবাহুল্য, তাঁরা মহাকরণে আধবেলা মিটিং করে কর্তব্য পালন করেন এবং দিল্লি ফিরে যান। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এই আমলারা জানেন যে তাঁদের মন্ত্রী চিদাম্বরম্ সাহেব কট্টর বাম সমর্থক। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় যতটা বামপন্থী ততটা কংগ্রেসী নন। কেরিয়ারিস্ট চতুর আই এ এস আমলারা তাই মহাকরণে দায়সারা মিটিং করে দিল্লি ফিরে যান। মমতাও চিদাম্বরমের চালাকিটা ভালোভাবেই বুঝেছেন। কিন্তু তাঁর তখন আর করার কিছুই নেই। শুধু ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের স্লোগান দিয়ে মুখ রক্ষা করা ছাড়া।

অথচ অসত্য তথ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে সংসদে সি পি এমকে অভিযুক্ত করার পূর্ণ সুযোগ ছিল তৃণমূল নেত্রীর। যেমন, কেন্দ্রীয় টিমের কাছে দেওয়া তথ্যে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব দাবী করেছেন চলতি বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন

(এরপর ৪ পাতায়)

আন্তর্জাতিক ধর্মান্তরকরণের জালে হিন্দু সমাজ

অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগে ধর্মান্তরকরণ

ডিসুজার কবল থেকে উদ্ধার হওয়া অনিলা ও সোনিয়ার সঙ্গে তাদের বাবা-মা।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সারা দেশজুড়েই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্মান্তরিত করছে খৃষ্টান মিশনারীরা। সম্প্রতি হরিয়ানার ফরিদাবাদে এক ব্রাজিলীয় মিশনারীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছেন স্থানীয় স্কুল পড়ুয়া বাচ্চাদের বাবা-মায়েরা। কম্যাডম্যাট চ্যারিটেবল ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ওই মিশনারীর নাম ডিমাস ডিসুজা। তাঁর বিরুদ্ধে দিল্লী হাইকোর্ট সরাসরি বলেছে যে ডিমাস যে-সমস্ত শিশুদের দত্তক নিয়েছিলেন, তাদেরকে বাবা-মায়ের কাছ থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। এই দত্তক নেবার পদ্ধতিটিও খুব অদ্ভুত। বেছে বেছে দরিদ্র পরিবারের মেয়েদেরকে ভালো খাওয়ার এবং পড়ার লোভ দেখিয়ে বাবা-মায়েদের কাছ থেকে নিজের হেফাজতে নেন ডিসুজা। তারপর সেইসব ছোট ছোট মেয়েদের ভর্তি করে দেন স্থানীয় এক কনভেন্ট স্কুলে। সেই স্কুলের রেজিস্টারে তাদের অভিভাবকের জায়গায় নিজের নাম বসিয়ে দেন ডিমাস ডিসুজা। শিশুদের অভিভাবকের বিনা সম্মতিতে এহেন দত্তক গ্রহণের পন্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তাদের বাবা-মায়েরা। সেইসব বাবা-মায়েদের বক্তব্য—"মিশনারী (ডিসুজা) বলেছিলেন বাচ্চারা যাতে ভালভাবে খেতে-থাকতে-পড়তে পারে সেইজন্যে তাঁরা নিয়ে যাচ্ছেন এবং বারো

(এরপর ৪ পাতায়)

কেরলে চলছে 'লাভ জেহাদ'

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। 'লাভ জেহাদ' নিয়ে কেরল পুলিশের ডিজি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মধ্যে যে মতপার্থক্য চলছিল তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেরল উচ্চ ন্যায়ালয় গত ৯ই ডিসেম্বর স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিল—"জোর করে ধর্মান্তরকরণ যেটাকে পরিভাষায় লাভ জেহাদ বা রোমিও জেহাদ বলা হচ্ছে তার বাস্তবতা রাজ্য সরকার কখনই উপেক্ষা করতে পারে না।" কেরল হাইকোর্ট আরও বলেছে—রাজ্য সরকারের দায়িত্ব বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য যাচাই করা এবং অন্যান্য রাজ্যের মতোই কেরল সরকারের উচিত বিষয়টিকে বিধানসভায় পর্যালোচনাভুক্ত করা।

বিচারপতি কে. টি শংকরণ অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জানিয়েছেন

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

রাজ্যপালকে বিদায় জানাতে না যাওয়া বুদ্ধ বাবু ও সিপিএমের চরম অসৌজন্যতা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সৌজন্য এবং ভদ্রতাবোধের শিক্ষা বামপন্থী তথা সি পি এম যে কোনওকালেই পায়নি তা রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর বিদায়বেলায় আবার প্রমাণ হলো। পাঁচবছর এরাজ্যে কাটিয়ে গেলেন গান্ধী। কিন্তু বিদায়বেলায় তাঁকে শেষবার রাজ্যপাল হিসাবে বিমানবন্দরে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন না মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। সরকারি সফরসূচি অনুযায়ী তাঁর কোনও বিশেষ কাজও ছিল না। তা সত্ত্বেও রাজ্যপালের প্রতি চরম অসৌজন্য দেখিয়ে তাঁকে 'সি-অফ' করতে না যাওয়াটা এরাজ্যের রাজনৈতিক শিষ্টাচারকে ভীষণভাবে কলুষিত করল। তবে এটাই প্রথম ঘটনা নয়, বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের কাছ থেকে এমন আচরণ রাজ্যবাসী আগেও দেখেছেন। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভাইপো নিজের 'পেডিগ্রি' নিয়েই যতই গর্বিত হোন না কেন তাঁর আচরণ বহুক্ষেত্রে পটুয়াপাড়ার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচারকেও ছাপিয়ে যায়। অবশ্য মূল্যবোধের প্রশ্নে মমতা বুদ্ধ দেবের থেকে এগিয়েই রয়েছেন। সেখানে বুদ্ধ দেববাবুর মাথায় রাজনীতির সংকীর্ণতাই বেশি করে চেপে বসে আছে। এর আগে রাজভবনে গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর শেষ 'সাংবিধানিক অনুষ্ঠান'ও বয়কট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সাংবিধানিক অনুষ্ঠানটি ছিল রাজ্য

গোপালকৃষ্ণ গান্ধী

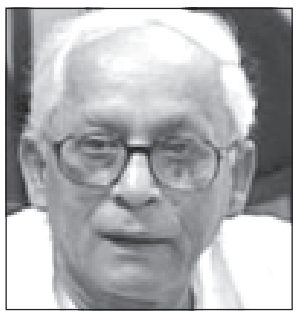

বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য

তথ্য কমিশনার হিসাবে প্রাক্তন ডিজির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। সেখানেও যাননি মুখ্যমন্ত্রী। যাননি পারিষদরাও।

বছর কয়েক আগে এন ডি এ জমানায় জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম শতবর্ষে কলকাতায় একটি বড় অনুষ্ঠান হয়েছিল। তাতে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের রাজনীতির সঙ্গে বামপন্থার রাজনীতি মেলে না বলে মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানে যাননি। কোনও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিকেও পাঠাননি। অথচ সেই অনুষ্ঠানে দেশের প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতানেত্রী উপস্থিত ছিলেন। লালকৃষ্ণ আদবানী বক্তৃতায় বলেছিলেন, যেদিন এন ডি এ সরকার ক্ষমতায় এল সেদিনই সি পি এম নেতা ই এম এস নাম্বুদিরিপাদের মৃত্যু হয়। বাজপেয়ীজি আমাকে বলেন, কারও কেরল যাওয়া উচিত। আমি তাঁকে বললাম, যদি অনুমতি দেন তো আমিই যেতে পারি। বাজপেয়ীজি বলনে, তাহলে তো খুব ভাল হয়। সেইমতো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে আমার প্রথম সরকারি সফর ই এম এসের দাহকার্যে উপস্থিত থাকা। তিনি কিন্তু আমাদের বন্ধুলোক ছিলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ আমাকে সেখানে যাওয়ার শিক্ষা দিয়েছিল। আজ খারাপ লাগছে, শ্যামাপ্রসাদের জন্ম শতবর্ষে রাজ্যের কোনও প্রতিনিধিকে না দেখতে পেয়ে। এটাই হচ্ছে সি পি এম। যে বুদ্ধ বাবু শ্যামাপ্রসাদকে সম্মান জানাতে পারেননি তিনি গান্ধীর নাতিকে ভদ্রতা দেখাবেন কি করে?

এই সময়

ব্যয়সংকোচ

মুখে ব্যয়-সংকোচের কথা বললেও ইউ পি এ সরকারের কাজকর্মে তা মোটেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ভি ভি আই পি-দের জন্য এখনকার এম-আই-১৭ হেলিকপ্টারের বদলে যে ১২টি এ-ডব্ল্যু-১০১ হেলিকপ্টার ফ্লীট কেনার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটির দাম ৩৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ সর্বসাকুল্যেও দাম পড়বে ৪২০০ কোটি টাকা। ব্যয়-সংকোচই বটে।

প্রথম স্বীকারোক্তি

পাক-সেনাবাহিনীর একাংশের সঙ্গে লস্কর-এ-তৈবার ও জয়েস-ই-মহম্মদের মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ রয়েছে—এই অভিযোগটাই ফেডারেল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশান (এফ বি আই)-এর জেরার মুখে স্বীকার করেই নিলেন ধৃত ডেভিড কোলম্যান হেডলি ওরফে দাউদ গিলানী। সেই কারণে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বরাবর করে এলেও এই প্রথম কোনও স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা (পড়ুন এফ বি আই) একথার সত্যতা স্বীকার করে নিল। প্রসঙ্গত, এফ বি আই-এর কাছে হেডলি নাগপুরে আর এস এস-এর প্রধান কার্যালয় সহ আটটি সন্ত্রাসবাদী টার্গেটের কথা বলেছে।

মুদ্রাস্ফীতির সার্কাস

অক্টোবর মাস নাগাদ মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১.৩ শতাংশ। আর এই ডিসেম্বরের মাঝ বরাবর তা বেড়ে দাঁড়াল ৪.৭৮ শতাংশ। সুতরাং দু'মাসে সার্কাসীয় লাফে মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি প্রায় তিনগুণ। ভরা শীতেও যে হারে জিনিসপত্রের দাম উর্দ্ধমুখী তাতে মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে না তো কি কমবে? কমার প্রসঙ্গ আসতই না যদি না ইউ পি এ সরকারের অর্থমন্ত্রীরা বছরভর বারংবার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ম্যাজিক দেখিয়ে খাতায় কলমে মুদ্রাস্ফীতিকে আয়ত্তে রাখার চেষ্টা না করতেন। কিন্তু তাঁদের ম্যাজিক এই শীতের মরসুমে মুদ্রাস্ফীতির সার্কাস-কে আটকাতে পারে কিনা তাই এখন দেখার!

গোলাবর্ষণ

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই কাশ্মীর ঘুরে যাওয়ার ১২ ঘণ্টার মধ্যেই বি এস এফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল পাক অনুপ্রবেশকারীরা। গত ১৩ই ডিসেম্বর সকালবেলায় আচমকাই ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্তে গুলি ছুটে আসে বি এস এফ জওয়ানদের দিকে। পাল্টা জবাব দেয় বি এস এফ-ও। প্রায় আধঘণ্টা ধরে এই গুলি বিনিময় চলে।

শ্রমিক-দরদী

শ্রমিক নেতা হলেই যে শ্রমিক-দরদী হওয়া যায় না কিংবা সমাজের অন্য অংশের মানুষ যেমন ফুটবলাররাও যে শ্রমিকদের ভালবাসতে পারে—এই কথাগুলোই যেন নতুন করে বোঝালেন মিডলসবার্গ ফুটবল দলের ফুটবলাররা। রতন টাটা গ্রুপ অধিগ্রহণ করেছিলেন কোরাস স্টীল। টীসসাইডে অবস্থিত এই কারখানাটি পরে নাম পাল্টে হয় "মথবল"। নতুন বছরে প্রায় ১৭০০ কর্মীকে ছাঁটাই করার কথা বলেছিল কর্তৃপক্ষ। অসহায় কর্মীদের দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয়ে গত ১২ই ডিসেম্বর মিডলসবার্গের ফুটবলাররা। 'সেভ আওয়ার স্টীল' লেখা টী-শার্ট পরে খেলতে নামেন।

মাও হামলা

গত ১৪ই ডিসেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের পিড়াকাটায় যৌথ বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালালো মাওবাদীরা। প্রায় আধঘণ্টা ধরে সেখানে উভয়পক্ষের গুলি বিনিময় চলে। উল্লেখযোগ্য, এই হামলার ঘণ্টাখানেক পূর্বে মাওবাদীদের একটি গোষ্ঠী রীতিমতো লিফলেট ছড়িয়ে আক্রমণ চালায় সি পি এমের স্থানীয় পার্টি অফিসে। সেখানে রাজা রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে আর প্রাণ যাচ্ছে উলুখাগড়াসম গ্রামবাসীদের।

ফনেস্কার ডিগবাজি

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হতে চাওয়া একদা সেনাপ্রধান জেনারেল শরৎ ফনেস্কা (যিনি এল টি টি ই-কে খতম করার অন্যতম কারিগরও বটে) মাঝেমধ্যেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ বাবুর মতো বেঁফাস মন্তব্য করে ফেলছেন। আবার চবিবশ ঘণ্টা যেতে না যেতেই সেটা অস্বীকার করছেন। ফনেস্কা গত ১৩ই ডিসেম্বর বলে বসেন—"এল টি টি ই-র বিরুদ্ধে যুদ্ধের শেষ তিনদিন অর্থাৎ ১৭, ১৮ ও ১৯শে মে কোনওরকম ক্রিমিনাল বিধি না মেনেই শ্রীলঙ্কা সরকারের হুকুমে (পড়ুন রাজাপক্ষের নির্দেশে) আত্মসমর্পণের সুযোগ না দিয়েই গুলি চালিয়ে তামিল টাইগারদের খতম করা হয়।" এরপর গত ১৪ই ডিসেম্বর তাঁর এই মন্তব্য বেমালুম অস্বীকার করেন ফনেস্কা।

বিমান বিভ্রাট

ক্রিসমাসে যেখানে খুশি যান, ভুলেও কিন্তু যাবেন না বিলেত বেড়াতে। কারণ বৃটিশ এয়ারওয়েজের কর্মচারীগণ গত ১৪ই ডিসেম্বর রীতিমতো গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে (অর্থাৎ ভোট দানের মাধ্যমে) সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগামী ২২শে ডিসেম্বর থেকে ১২ দিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে তাঁরা ক্রিসমাসের ছুটি পালন করবেন। তাদের এহেন সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কর্তৃপক্ষের বিমানের ক্রু- সংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত, সেইসঙ্গে ভাতার পরিমাণ অদল-বদলের সম্ভাবনাও।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

তেলেঙ্গানা—কংগ্রেসের এক কূট চাল

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার শেষমেশ অন্ধ্রকে ভাগ করিবার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলেন। তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্র হইতে আলাদা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। কারণ তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতির (টি. আর. এস.) আমরণ অনশনে মৃত্যুর হুংকার দিয়াছিলেন তাহাদের নেতা কে. চন্দ্রশেখর রাও। যাহার দলের বর্তমান বিধানসভায় তেলেঙ্গানা হইতে মাত্র ১০ জন বিধায়ক। সংসদে মাত্র ২ জন সাংসদ। এই ১২ জনই তেলেঙ্গানা অঞ্চ ল হইতেই নির্বাচিত হইয়াছেন। এই অঞ্চ ল হইতে ১১৯ জন বিধায়কের মধ্যে মাত্র ১০ জন টি. আর. এস'-র আর ১৭ জন সাংসদের মধ্যে মাত্র ২ জন টি. আর. এসের। সেখানে তেলেঙ্গানা হইতে কংগ্রেস নির্বাচিত করিয়া আনিয়াছে ৫০ জন বিধায়ক ও ১২ জন সাংসদকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে তেলেঙ্গানার সমস্ত মানুষই তেলেঙ্গানাপন্থী টি. আর. এস. ভক্ত নয়। তবে কংগ্রেসের অন্তরাত্মার অনুমত্যানুসারে কেন্দ্রের কংগ্রেস-জোট সরকারের হঠাৎ এই ঘোষণা কেন? তাহার সবকিছুই তো বৃহৎ কোনকিছু কৌশল বা চক্রান্তের অঙ্গ।

মনে রাখিতে হইবে মুসলিমগণ কিন্তু অত্যন্ত উল্লসিত। ঘোষণার আগের দিন ৮ই ডিসেম্বরই অনেক মুসলিম সংগঠন-এর অধীন সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ চারমিনারের সামনে তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে ধরনায় বসিয়াছিলেন। মুসলিম তোষণে বহু ঐতিহ্যের অধিকারী কংগ্রেস দল নিজাম শাসিত হায়দরাবাদকে যে পুনরায় স্বাধীন রাজ্যের মর্যাদা দিবে তাহাদের আর আশ্চর্যের কি আছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি। চন্দ্রশেখরের আমৃত্যু অনশন তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছে মাত্র।

মুসলিম তোষণের অস্ত্র তিনি শানাইয়াই রাখিয়াছেন। পৃথক রাজ্য ঘোষণার দিনই প্রধানমন্ত্রীকে দিয়া তিনি তাহার নবতম অস্ত্র রঙ্গনাথন রিপোর্ট প্রকাশ করাইয়া দিয়াছেন। প্রাক্তন ভারতের বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথন মিশ্র'-র নেতৃত্বে গঠিত National Commission on Religious Linguistic Minorities তাঁহার রিপোর্ট কিন্তু আড়াই বছর আগে ২০০৭ এর ২২শে মে সরকারের কাছে পেশ করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যেমন চিরকালই তাহাদের আজ্ঞাবহদের দ্বারা গঠিত কমিশন, কমিটি প্রভৃতির রিপোর্ট ফাইল বন্দী করিয়া রাখে সময়মত ছাড়িবার জন্য, যেমন—মণ্ডল কমিশন, লিবারহান, শ্রীকৃষ্ণ রিপোর্ট ইত্যাদি, এক্ষেত্রেও এটি তৈয়ারী করিয়াই রাখিয়াছিলেন। নতুন রাজ্য তেলেঙ্গানার মুসলিম ভোট যাহাতে অটুট থাকে তাই এই রিপোর্ট প্রকাশ।

বৃটিশ ভারত ত্যাগের পর মুসলিম নিজাম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যে স্বপ্ন এখন তেলেঙ্গানার অধীন মুসলিমরা দেখা শুরু করিয়াছে। লৌহ মানব বল্লভভাই প্যাটেলের পাঠানো সৈন্যবাহিনী নিজামের সেই স্বপ্ন চুরমার করিয়া দিয়াছিল। ১৯৫৩-র ১লা অক্টোবর গঠিত হইল অন্ধ্রপ্রদেশ। কিন্তু তিন বছর বাদেই বিন্ধ্য পর্বত ও গোদাবরীর মাঝের পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা নিজামাধীন তেলেঙ্গানা অঞ্চ লকে জুড়িয়া দেওয়া হয় অন্ধ্রপ্রদেশের সাথে ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর। সেই শুরু সংঘাত। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে তেলেঙ্গানাকে আলাদা রাজ্যের পক্ষেই মত দিয়াছিল।

রাজ্যের স্বার্থ, রাষ্ট্রের স্বার্থ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ধারা বজায় রাখার স্বার্থও কোনও রাজ্যগঠনের পক্ষে বিবেচ্য। এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে, সংযুক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে মুসলিম সংখ্যা ৯.২ শতাংশ। তপশিলি উপজাতির সংখ্যাও বাড়িয়া তেলেঙ্গানা রাজ্যে হইবে ৮.৯ শতাংশ। পর্বতসঙ্কুল অনুর্বর ভূমি নির্ভর, প্রাকৃতিক সম্পদহীন তেলেঙ্গানায় সেচের জলের প্রচণ্ড অভাব থাকায় এই অঞ্চ লেই কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা অধিক। অভাব অনটন থাকায় খুব স্বাভাবিকভাবেই মাওবাদীরা গড়িয়া তুলিয়াছে এখানে তাহাদের শক্ত ঘাঁটি। মাওবাদীদের সঙ্গে ইসলামিক রাষ্ট্রবিরোধী গোষ্ঠীগুলির যোগাযোগ যে পূর্ব হইতেই আছে তাহা সকলেরই জানা। অতএব ভবিষ্যতে মুসলিম গোষ্ঠীগুলি যে হায়দরাবাদকে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে দাবী করিয়া বসিবে না এমন গ্যারান্টি কে দিবে?

কংগ্রেস তাহার স্বভাব মতোই একটি কমিশন গঠন করিয়া বিলম্বিত করিবেই। এবং সেই কমিশনার রিপোর্টও সময়মত ব্যবহার করিবেই। বিরোধী দলের উচিৎ সদা সতর্ক থাকা যাহাতে এই কংগ্রেস সরকার কোনও ইস্যুকেই নিজের খুশিমতো সময়ে ফাইল হইতে বাহির করিতে না পারে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা পুণ্যতীর্থ ভারত জননীর সন্তান। শস্যশালিনী আমাদের এই জন্মভূমি সম্পদ বল, সংস্কৃতে বল, ধর্মবলে বল, কতই না গরীয়ান, কত গৌরবময়। এই পুণ্যভূমিতেই ঋষিগণ সামস্তোত্র গান করিতেন, বেদান্ত উপনিষদ ব্যাখ্যা করিতেন, মুক্তির বার্তা বহন করিতেন। এই ভারতভূমি, পরম অধ্যাত্মবাদের পুণ্যক্ষেত্র, এখানকার দর্শন বিজ্ঞান মানব জীবনের দুঃখবেদনা হরণ করিয়া পরম শান্তি প্রদান করে, সমগ্র পৃথিবী এই প্রাচ্যভূমির নীতি ও আদর্শে সঞ্জীবিত। এখানকার ধর্মমতই একদা চীন, জাপান প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু ক্রমে আমাদের শিষ্যগণ গুরুকেও অতিক্রমের চেষ্টা করিয়াছে। তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ—কিরূপ প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব তাহারা তাহা দেখাইয়াছে।

—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বদেশ মন্ত্র বন্দেমাতরম্

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

'বন্দে মাতরম্' নিয়ে আবার এক বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আপত্তি এসেছে একটা মুসলিম সংগঠনের তরফ থেকে।

আগে এই সঙ্গীতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সব স্কুলে ২০০৭-এর ৭ই সেপ্টে ম্বর এর প্রথম দুটো পঙক্তি গাওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করেছিল। তাতে ''দারুল উলুম দেওবন্দ', 'অল-ইন্ডিয়া-উওমেন পার্সোনাল ল বোর্ড' প্রভৃতি সংস্থা দারুণ ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। অনেক ইমামও জানিয়েছিলেন যে, এই গানে দেশকে মাতা হিসেবে বন্দনা করেছে—এটা শরিয়ত বিরোধী। এই কারণে অনেক মুসলিম সংস্থা ও নেতা সেদিন মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন।

ঠিক বিপরীত দিকে বি. জে. পি. নেতৃত্ব তো বটেই, অন্য অনেক ব্যক্তিই এই মানসিকতার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁদের মতে, এই গান দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করে—সুতরাং ধর্মমত-নির্বিশেষে এই সঙ্গীত রচনার শতবর্ষ পূর্তির দিন এটা গাওয়া বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত। বি. জে. পি. নেতা মুখতার আববাস জানিয়েছেন, বন্দেমাতরম্-এর বিরোধিতা করাটা বিচ্ছিন্নতা প্রসূত ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। তাঁর মতে, দেশটা শরিয়তী শাসনে চলে না—সেই জন্যই সব ব্যাপারে শরিয়তের দোহাই না দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের উচিত এই গানের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

এই প্রসঙ্গে আগে একটু অতীতের কথায় ফিরে যাই।

মনে রাখতে হবে 'বন্দে মাতরম্' শুধু একটা গান নয়—এটা একটা মন্ত্রও, যার মাধ্যমে জাতীয় চেতনা গড়ে উঠেছিল এক শতাব্দী আগে, এর মাধ্যমেই আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সারা দেশকে উদ্বেল করে তুলেছিল। 'দেশ' রাগের ওপর রচিত গানটা গাওয়া অবশ্যই একটু কঠিন ব্যাপার—কিন্তু ক্রমে এই শব্দটাই স্বদেশমন্ত্র হিসেবে মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। তখন আর সুরের দরকার হয়নি—স্বরই দেশের মানুষের রক্তে দোলা দিয়েছে। পুরো গানটা অনেকে জানেননি—তার প্রথম শব্দ দুটোই সবাইকে প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার মহাযজ্ঞে টেনে এনেছে। তখন এটা হয়ে গিয়েছে স্বদেশ মন্ত্র।

শুধু তাই নয়—বঙ্গভঙ্গ-সংক্রান্ত আন্দোলনের (১৯০৬) মাঝখানে 'ব্রতী সমিতি', 'সন্তান সম্প্রদায়' ইত্যাদি সংগ্রামী সংস্থার পাশাপাশি 'বন্দে মাতরম্' নামে বিপ্লবী দলও গড়ে উঠেছিল—(ডঃ নিমাই সাধন বসু—দ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল মুভমেন্ট, পৃঃ ৫০)। আর এই নামে তখন সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টই' জানিয়েছেন যে, সেই সময় 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দে মাতরম্' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা দেশে আগুন ছড়াত—(টেররিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১২)।

অবশ্য 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রই সংস্থা ও পত্রিকার উৎস ছিল 'বন্দে মাতরম্' গানটাই। এই গান দিয়েই সেই সময় দেশের মরা গাঙে বান এসেছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কথাই ধরা যাক।

বলা বাহুল্য, এদেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এত বড় আন্দোলন আর ঘটেনি। অথচ এই ব্যাপক আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত। অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ গুণীজনের গানও তখন মানুষের মুখে-মুখে ফিরেছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' তখন হয়ে উঠেছিল সংগ্রামী মানুষের মূল প্রেরণা। ডঃ পি. এন. ডোগ্‌রা মন্তব্য করেছেন, The soulstirring song Vande Mataram composed by Bankim Chandra now become the war-cry against the British imperialism—(ইন্ডিয়া 'জ স্ট্রাগ্‌ল্ ফর ফ্রীডম, পৃঃ ১৯)। চন্দ্র-ত্রিপাঠী-দে লিখেছেন, স্বদেশসেবীরা গঙ্গাস্নান করে এসে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত গেয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে জাগরণ এনেছেন। এটাই ছিল তাঁদের রণধ্বনি—(ফ্রীডম-স্ট্রাগ্‌ল্, পৃঃ ৮৭)।

> **বন্দেমাতরম্-এর বিরোধিতা করাটা বিচ্ছিন্নতা প্রসূত ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ব্যাপার। তাঁর মতে, দেশটা শরিয়তী শাসনে চলে না—সেই জন্যই সব ব্যাপারে শরিয়তের দোহাই না দিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের উচিত এই গানের মাধ্যমে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া।**

আজ এক শতাব্দী পরে হয়ত সেই উন্মাদনার রূপটা বোঝা যাবে না, কিন্তু সেদিন বঙ্গভঙ্গ রোধের সেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ভারতবর্ষের নব জাগরণ এনে দিয়েছিল। সেই জোয়ার পৌঁছে গিয়েছিল ওড়িশা, দিল্লি, কাংড়া, কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠেছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও গানে। ডঃ এস এন সেনের ভাষায়--'The cry of Bande Mataram now filled the air' (হিস্ট্রি অফ দ্য ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃঃ ৯৩)। রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' প্রভৃতি গান সেদিন সারা বাংলাকে আবেগ-মথিত করেছিল, কিন্তু সব কিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটাই। ক্রমে এটা সঙ্গীত থেকে দেশ-মন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ-সরকারের কাছে এটা হয়ে উঠেছিল এক বিস্ফোরক স্লোগান—তাই এটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল নির্মমভাবে। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন—এই মন্ত্রকে মহা-সংগ্রামের দুন্দুভি ধ্বনি বলেই মনে করা হয়। এই সঙ্গীত যে মুমুক্ষু ভারবাসীকে টেনে নিয়ে চলেছে মৃত্যুর অমৃত-পথে, সেই কথাটাই সভয়ে মনে করত বৃটিশ শাসকরা—এটা ছিল 'red rag to the bull'—(ফ্রব কাল্‌চারাল টু মিলিট্যান্ট্ ন্যাশনালিজম্', ফ্রীডম মুভমেন্ট অ্যাণ্ড অনুশীলন সমিতি, সম্পা ঃ ডঃ বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য পৃঃ ৩৮)।

এটা মনে রাখা দরকার যে, ১৮৭৬ সালে বঙ্কিমচন্দ্র এই গানটা রচনা করেন এবং পরে—১৮৮২ সালে এটা তাঁর সুবিখ্যাত 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে সংযুক্ত করেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন—এই গানের মর্মার্থ পরে বোঝা যাবে—তখন হয়ত তিনি থাকবেন না। তাঁর বড় মেয়েকেও তিনি বলেছিলেন, বিশ-তিরিশ বছর পরে এই গান নিয়ে বাঙালী উন্মত্ত হয়ে উঠবে, মেতে উঠবে এক অভাবনীয় আবেগে—(অধ্যাপক নবকুমার ভট্টাচার্য— 'বন্দে মাতরম্-এর সূতিকাগৃহ ধ্বংসপ্রাপ্তির পথে', স্বস্তিকা, ৬ই ভাদ্র, ১৪১৩)।

ঋষি বাক্য মিথ্যে হয় না—১৯০৫ সাল থেকেই এই গান, এই ধ্বনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। তাঁর সেই মহাসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বদেশ ভূমি ধর্মীয় দেবীমূর্তির সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অকল্পনীয় ভাবাবেগের সৃষ্টি করেছিল—এটাই ছিল আমাদের পবিত্র স্বদেশ মন্ত্র (ডঃ শঙ্কর ঘোষ—স্বাধীনতা-সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন, পৃঃ ৩৯)।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ যুগকে অতিক্রম করে এটা ক্রমে বিপ্লববাদেরও মন্ত্র হয়ে উঠেছে। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র বাংলার বিপ্লবীদের হৃদয়- মনকে মথিত করেছিল। সমগ্র জাতিকে এই মহা-সঙ্গীত দিয়েছিল জীবন ও মৃত্যুর নিঃশেষ অনুপ্রেরণা—('শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে বঙ্গভঙ্গ'—সমাজবাদী ভাবনা, ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৯০)।

আসলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম ও বিপ্লববাদের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিলেন। এই গান ও মহেন্দ্র-ভবানন্দের সংলাপ বাংলায় এনেছিল বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, 'গীতা', নিবেদিতার কার্যকলাপ, অরবিন্দ ঘোষের দীক্ষা প্রভৃতি অবশ্যই ছিল বাংলার বিপ্লববাদের ভিত্তি। সেইজন্য ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার চিহ্নিত করেছেন—(মিলিট্যান্ট ন্যাশনালিজম্ ইন্ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১)। এই গান ও ভবানন্দের কথাগুলোতে ছিল সেই বিপ্লবের বারুদ—(ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার— হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩০)। এমন করেই তখন 'বন্দে মাতরম্ ও সঙ্গীত পরাধীন ভারতবাসীকে মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত করেছে, এনে দিয়েছে নব-জাগরণের সেই জন্ম। দেখা গেছে, প্রাণ দেওয়া নেওয়ার সময় তাঁরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ রেখে গেছেন এক মহাবাণী—'ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের নিকট বলি-প্রদত্ত।' আর 'বন্দে মাতরম্' শিখিয়েছে—দেশজননীই সেই মা—তাঁর মুক্তির কাজে আত্মবলিই হল তারুণ্যের একমাত্র কর্তব্য। সেইজন্য বিপ্লবীরা সেই মায়ের কাছে আত্মাহুতি দিয়েছেন—জীবন-মৃত্যু তখন 'পায়ের ভৃত্য' হয়ে গিয়েছে। মনে করে দেখুন—দীনেশ গুপ্ত হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছেন, তখন তাঁর কণ্ঠে ছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি—(শৈলেশ দে—ইতিহাস মনে রাখেনি, পৃঃ ৮৯)। ঠিক তেমনি—কানাইলাল দত্ত-সত্যেন বসু, বিশ্বাসঘাতক

(এরপর ৪ পাতায়)

বুদ্ধ প্রশাসন চরম ব্যর্থ

(১ পাতার পর)

হয়েছে ৬৯ জন। এর মধ্যে জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের হাতে খুন হওয়া ব্যক্তিরাও আছেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের দাখিল করা রিপোর্টে বলা হয়েছে যে গত ১৮ জুন কেন্দ্রীয় বাহিনী জঙ্গলমহলে অভিযান শুরু করার পর মাওবাদীদের পাল্টা হানায় ৪৯ জন সাধারণ মানুষ এবং ৮ জন পুলিশ কর্মী খুন হয়েছেন। রাজ্য পুলিশের প্রধান কর্তা ভূপিন্দর সিং তাঁর রিপোর্টে বলেছেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জুড়ে বিস্তৃত জঙ্গলমহলে মাওবাদীদের হাতে ৭৫ জন 'সিভিলিয়ান' খুন হয়েছেন।

এরপর গত বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য লিখিতভাবে জানান যে চলতি বছরে ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৮৪৫টি রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ওই সব রাজনৈতিক সংঘর্ষে খুন হয়েছেন ১,৭৯৪ জন। সি পি এম দলের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু মঙ্গলবার (১ ডিসেম্বর) আলিমুদ্দিনে পার্টির সদর দফতরে ডাকা সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, চলতি বছরের নভেম্বর মাস পর্যন্ত তৃণমূল এবং মাওবাদীদের হাতে ১১০ জন সিপি এম কর্মী খুন হয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী দাবি করেছেন চলতি বছরে তাঁর দলের ৮৫ জন শহীদ হয়েছেন। পরে অবশ্য বলেছেন, ৮৫ নয় আমার দলের ৫০০ কর্মী খুন হয়েছেন।

প্রশ্নটা ঠিক এখানেই। কে বা কারা সঠিক তথ্য দিয়েছেন? মনে হয় কেউই নয়। একটা মিথ্যা ঢাকতে একশো মিথ্যা এখন রাজ্য সরকারকে বলতে হচ্ছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস-তৃণমূল জোটের নেতা নেত্রীরা তাঁদের ঘরোয়া কোন্দল নিয়ে এতটাই ব্যতিব্যস্ত যে সঠিক তথ্য সংগ্রহে তাঁরা আগ্রহী নন। শুধু '৩৫৬ ধারা চাই' বলে গলাবাজি করলেই হাততালি পাওয়া যায় না। তথ্যের ভিত্তিতে কাগজে কলমে প্রমাণ করতে হয় যে রাজ্য সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শাসক দল রাষ্ট্রযন্ত্র এবং দলীয় কর্মীদের ব্যবহার করে খুনের রাজনীতি শুরু করেছে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। প্রথমে ৮৫ জন শহীদের তালিকা দিয়ে পরে তা ৫০০ করে দিলে মোটেই বাহবা পাওয়া যায় না। বরং বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

খুনের তথ্য নিয়ে যতই বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, একটা সত্য দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে, বামফ্রন্ট সরকার আর প্রশাসন চালাতে পারছে না। বর্তমান বুদ্ধ মন্ত্রিসভার দায়বদ্ধতা এবং শৃঙ্খলা নেই। শরিক দলের মন্ত্রীরা সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে সেসব কথা বলছেন, তারপরেও কীভাবে তাঁরা মন্ত্রীর চেয়ারে বসছেন বোঝা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী যদি পুলিশ প্রশাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হন তবে সেই ব্যর্থতার দায় মন্ত্রিসভার সব সদস্য মন্ত্রীকেই নিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতি অচল। বামফ্রন্টের ছোট শরিক কিরণময় নন্দ বলছেন, লোকসভা এবং বিধানসভার উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের ভরাডুবির পর বিধানসভার নির্বাচন ২০১১ সালের পরিবর্তে ২০১০ সালের মার্চ-এপ্রিলে করা হোক। অন্যদিকে, সি পি এম মন্ত্রীরা জবাবে বলেছেন, কিরণময় সুবিধাবাদী রাজনীতি করেন। সুযোগ বুঝে মুচলেকা দিয়ে ফ্রন্টের শরিক হয়ে মন্ত্রীত্ব করছেন। এখন চেষ্টায় আছেন তৃণমূলে ভিড়তে।

হ্যাঁ, তারপরেও কিরণময় নন্দ রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রীর চেয়ারেই আছেন। মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী প্রশাসনে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফেরাতে নোটিশ দিচ্ছেন। অথচ তাঁদের দলেরই মন্ত্রীরা সেইসব নির্দেশ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিচ্ছেন। এরপরেও কী বলতে হবে, সব ঠিক হ্যায়!

কেরলে চলছে 'লাভ জেহাদ'

(১ পাতার পর)

যে রাজ্যে মুসলমানরা ভালবাসার জালে হিন্দু নারীদের আবদ্ধ করে এক ঘৃণ্য পথে হিন্দুনারীদের মুসলমানী বানানোর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। তিনি এই ইসলামী জিহাদকে "প্রেম-জিহাদ" (Love jihad) আখ্যা দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের কার্যকলাপকে মিথ্যা প্রবঞ্চ না বলে তিনি বিষয়টাকে "deceptive conversion" হিসাবেই দেখিয়েছেন। বিচারপতির মতে এই ধরনের ধর্মান্তরকরণ বেআইনী ভালবাসার মুখোশের আড়ালে এক শয়তানি।

বিচারপতির এই ধরনের মতামতের ভিত্তি হলো পুলিশ রিপোর্ট। পুলিশ রিপোর্টে জানানো হয়েছে যে এটি কোনও ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পিছনে রয়েছে একটি গোটা ধর্মীয় সম্প্রদায় যারা সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত ভাবে এই নয়াপথে হিন্দুদের (কেরলে খৃষ্টানদেরও) সংখ্যা কমিয়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পথে নেমেছে।

এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট ছত্তড্ডণ্ঠগ্ন এবং ক্যাম্পাস ফ্রন্ট নামক কিছু মৌলবাদী সংগঠন দেশের বিভিন্ন শহরের কলেজ ক্যাম্পাসে ঘাঁটি গেড়েছে। এদের পরিকল্পিত লক্ষ্য হলো অবস্থাপন্ন উচ্চবর্ণজাত মেধাবী হিন্দু ও খৃষ্টান মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলা। বেশ কিছু মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনের আশীর্বাদপুষ্ট এই কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে ১৯৯৬ সাল থেকে। কর্ণাটকে এই কর্মকাণ্ড শুরু করার অব্যবহিত পরেই হিন্দু ধর্মরক্ষা বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে পড়ে এবং এর ফলে কেরল সি পি এম-এর এক নেতার কন্যা ধরা পড়ায় এটা বন্ধ হয়।

দারিদ্র্যের সুযোগে ধর্মান্তরকরণ

(১ পাতার পর)

ক্লাস অবধি পড়াশোনা করার পর বাচ্চাদের আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু এখন আমাদের সঙ্গে মেয়েদের দেখা পর্যন্ত তিনি করতে দিচ্ছেন না। উপরন্তু আমাদের মেয়েদের অভিভাবকের জায়গায় নিজের নাম পর্যন্ত বসিয়ে দিয়েছেন তিনি।"

অভিভাবকদের এই অভিযোগের পর আরও মারাত্মক তথ্য উঠে এসেছে পুলিসি তদন্তে। পুলিস সংশ্লিষ্ট কনভেন্ট স্কুলের রেজিস্ট্রেশন খাতা চেক করে দেখেছে, ডিসুজা সমস্ত বাচ্চাদের খৃষ্টান নাম রেখেছে, এমনকী তাদের পারিবারিক ঠিকানাগুলো পর্যন্ত বদলে মিশনারী পরিচালিত একটি ছাত্রবাসের ঠিকানা সেখানে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তার ওপরে বাচ্চাদের অভিভাবক হিসেবে নিজের নামই লিখেছে ডিসুজা।

ডিসুজার খপ্পর থেকে উদ্ধার হওয়া মাণ্ডিগ্রামের অনিলা ও সোনির বাবা সুরেশ পাসোয়ানের অভিযোগ—"আমরা কখনই আমাদের মেয়েদের দত্তক দিইনি ডিসুজার কাছে। ডিসুজাই বরং ইংরেজিতে লেখা কিছু কাগজে আমায় সই করতে বলেন। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় লেখা ছিল বলে আমি তা পড়তে পারেনি। এছাড়া তিনি আর কোনও কাগজপত্র আমায় দেননি। এমনকী তাদের থাকার হোস্টেল অবধি গ্রীণ ফিল্ড কলোনি থেকে সেক্টর ২১-ডি-তে স্থানান্তরিত করে দেন, কিন্তু আমাকে জানানোর প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করেননি তিনি। গত বছরের ১১ই ফেব্রুয়ারি ওইসব বাচ্চাদের এফিডেফিটের আবেদনে ডিসুজা দিল্লী হাইকোর্টে জানিয়েছিলেন যে তিনি 'স্থায়ীভাবে'-এ দত্তক নিতে চাইছেন সংশ্লিষ্ট বারো জনকে, যাদের লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ-খরচার সঙ্গে সঙ্গে থাকা-পরার যাবতীয় খরচাপাতিও তিনিই দেবেন। অথচ ওই বছরেরই অক্টোবরে যে বাড়িটা তিনি ভাড়া নেন তার মালিক জয়সী রাম আস্থানার সঙ্গে চুক্তিপত্রে তিনি লেখেন, ভারতীয় বংশোদ্ভুত দশ-বারোজন দরিদ্র ও অনাথ শিশুদের থাকার জন্য তিনি ঘর-ভাড়া নিচ্ছেন। একদিকে আদালত, অন্যদিকে বাড়ি ভাড়ার চুক্তি—এই দু'য়ের অসামঞ্জস্যই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে যে দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শিশুদের ধর্মান্তরকরণে কতটা পরিকল্পনা-মাফিক এগোচ্ছে খৃষ্টান মিশনারীরা।

স্বদেশ মন্ত্র বন্দেমাতরম্

(৩ পাতার পর)

নরেন গোঁসাইকে হত্যা করে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করেছেন, আবার ফাঁসির সময়ও উচ্চকণ্ঠে তাঁরা এই ধ্বনি তুলেছেন—(নন্দ মুখোপাধ্যায়—'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য', পৃঃ ৪৬)।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। বিপ্লবীদের সকলেরই মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্'। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, গোপীনাথ সাহা, বাঘা যতীন, চিত্তপ্রিয় মুখার্জী, ভবানী ব্যানার্জী প্রমুখ মৃত্যুঞ্জয়ী বীররা মৃত্যুবরণ করেছেন ওই মহামন্ত্র উচ্চারণ করেই। তাঁদের দর্শন ছিল—দেশমাতৃকার পায়ে আত্মবলি দিতে হবে এমন অনেককেই, তবেই আসবে স্বাধীনতা। টেগার্টকে মারতে গিয়ে অনুজা দত্তের হাতেই বোমা ফেটেছে, পেটের নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে তাঁর—রাইটার্সের উল্টোদিকে গোলদিঘির রেলিং ধরে তিনি মৃত্যুর প্রহর গুনেছেন—তখনও তাঁর কণ্ঠে ছিল 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। মৃত্যুত্তীর্ণ শহীদ যতীন দাস চৌষট্টি দিন অনশন করে মৃত্যুর দিকে এগিয়েছেন—কিন্তু তাঁর কোনও কষ্ট ছিল না—'বন্দে মাতরম্' তাঁকে শান্তি আর সহ্যশক্তি এনে দিয়েছে। 'মাস্টারদা' (সূর্য সেন) ফাঁসির মঞ্চের দিকে যখন চলেছেন, তখন বন্দী তরুণরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কারাকক্ষ কাঁপিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ যখন কথা বের করার জন্য বিপ্লবী-বীরদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, তখনও তাঁরা সেই অসহ্য কষ্টকে জয় করেছেন এই মহা মন্ত্রের মাধ্যমে। এটাই ছিল তাঁদের প্রাণের স্পন্দন, তাদের মৃত্যুর প্রেরণা। আত্মা অবিনশ্বর—সুতরাং শহীদ হয়ে আবার তাঁরা ফিরে আসবেন এই দুঃখিনী মায়ের কোলে। এমনি করেই বারবার আসা-যাওয়ার মধ্যে একদিন সেই দেশ-জননী মুক্ত হবেন—সত্যিই 'সুজলা-সুফলা-মলয়জ-শীতলা হবেন—এই স্বপ্নই তাঁদের তৎপর করে তুলেছিল। আর এই গান গেয়েই তাঁরা জেনে গেছেন, এই গানের সুর গুনগুনিয়েই তাঁরা কারা-যন্ত্রণা ভুলেছেন, দুঃখকে জয় করেছেন।

কিন্তু শুধু বিপ্লব আন্দোলনেই নয়, কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস-আন্দোলনেও এক অদ্ভুত প্রেরণা দিয়েছে এই গান। সেই সময় হাজার হাজার নারীও এগিয়ে এসেছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে। প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদার, শান্তি ঘোষ, সুনীতি ঘোষ প্রমুখ বীরাঙ্গনারা বিপ্লবের পথ নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বহু নারীও 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের টানে যোগ দিয়েছিলেন কংগ্রেসের অহিংসা-আন্দোলনেও।

১৯৩০ সালের আন্দোলনের সময় মানুষের মাথার খুলি ফেটেছে পুলিশের লাঠি গুলিতে রক্ত ঝরেছে অঝোরে। কিন্তু মুখে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র নিয়ে সবাই তা সহ্য করেছেন—এটাই ছিল তাঁদের অভয়-সঙ্গীত। 'নিউ ইয়র্ক টেলিগ্রাফ-এর ওয়েব্ মিলার লিখেছেন, তিনি মাঝে মাঝে শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করেছিলেন। কোথায় মানুষ পেয়েছিলেন এই মৃত্যুত্তীর্ণ দেশাত্মবোধ? ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—সেটা ছিল 'reign of terror'—(হিস্ট্রি অফ ফ্রীডম মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৩)। ব্রিটিশ অস্ত্রের বিরুদ্ধে এই দেশের মানুষের অস্ত্রই ছিল 'বন্দে মাতরম্'।

আগস্ট-আন্দোলনেও এটাই দেখা গেছে। মাতঙ্গিনী হাজরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর হাত থেকে পতাকা নিয়ে সেই মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়েই পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন নগেন্দ্রনাথ সামন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, জীবনকৃষ্ণ বেরা প্রমুখ বীর শহীদ— (প্রিয়নাথ পাল মাতঙ্গিনী হাজরা, পৃঃ ৫২)।

মনে রাখতে হবে যে, অন্য জাতীয় সঙ্গীতটা ('জনগণমন') কিন্তু এতটা উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারেনি। তার আবির্ভাবও ঘটেছে অনেক পরে—কংগ্রেস-মঞ্চে এটা গীত হয়েছে ১৯১১ সালে। তাছাড়া এই 'অধিনায়ক' কে—এই নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল—(ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন—ইন্ডিয়া'জ ন্যাশনাল অ্যান্থেম, পৃঃ ৮)। আর তাতে দেশকে মাতৃ-মর্যাদাও দেওয়া হয়নি। মনে হয়, বিলেতী 'মার্চ-মিউজিক'-এর সুরে এটা রচিত হওয়ায় গাওয়ার সুবিধে ছিল বলে এটাও গৃহীত হয়েছে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে—এতেও রয়েছে ঐক্যের সুর। বলা হয়েছে এই গানের সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটাও গৃহীত হবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে, কারণ দ্বিতীয়টার সঙ্গে রয়েছে জাতীয় আন্দোলনে 'historic part'-এর স্মৃতি (গণপরিষদের বিতর্ক, দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ২)।

এই মহাসঙ্গীত তার শতবর্ষ পূর্তিতে গাওয়ার ব্যাপারে এত আপত্তি উঠেছিল কেন? বাধাটা ধর্মীয়? কিন্তু আমাদের দেশ তো কোন ধর্মকে নিষিদ্ধ করেনি, বরং গ্রহণ করেছে উদার ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতটা স্মরণ করিয়ে দেয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহত্তর অধ্যায়কে, স্মরণ করায় জানা-অজানা শহীদ-সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করে দেশপ্রেমে। এটাও শরিয়তে বাধে? অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রচনার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে। সেটাও হয়নি শরিয়তের বাধায়? সব কিছুতেই বাধা হয়ে উঠছে শরিয়ত? তাহলে আমাদের গৌরবের স্মৃতিকে মনে রাখা যাবে না? স্মরণ করা যাবে না অগণিত দেশসেবকদের কথা? ভুলে যেতে হবে সেই মহা-সঙ্গীতের কথা যা আমাদের দিয়েছে স্বাধীনতা ও বাঁচার মন্ত্র।

মেয়ে পাচারচক্র

(১ পাতার পর)

হচ্ছে তাই নয়, বাগানের ছেলে-মেয়েদের দিল্লী, হরিয়ানা সহ ভারতের বড় বড় শহরে বাড়ীতে কাজের লোক হিসাবে নিয়োগ করছে কিছু বেসরকারি এজেন্সি। এদের বয়স ১০-১৬ বছরের মধ্যে। দালালদের খপ্পড় থেকে পালিয়ে এসেছে টুম্পা ওঁরাও, মনি তিরকি, উইলসন টুডুর মতো চা শ্রমিকের সন্তানরা। নারী পাচার রোধ করা নিয়ে সচেতনতার সরকারি বিজ্ঞাপন কতিপয় থানায় ঝুললেও বন্ধ হয়নি মেয়ে পাচার। দুষ্ট নারী পাচারকারীদের ভয়ানক থাবা থেকে আদৌ কি ডুয়ার্সের সহজ-সরল চা বাগানের মেয়েরা মুক্তি পাবে? সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে মহকুমাবাসীর মনে।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্য কংগ্রেসকে মমতার নেতৃত্বাধীন থাকার নির্দেশ প্রণবের

নিশাকর সোম

রাজ্য-কংগ্রেসের চিন্তন শিবির হয়ে গেল। এই শিবির কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রণব মুখার্জির নির্দেশে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। নাম দেওয়া হয়েছিল "চিন্তন" শিবির। নামটা বিজেপি-এর কাছ থেকে ধার করা নয় কি? চিন্তন শিবির হওয়ার পিছনে যে কাহিনীটা আছে তা'হলো রাহুল গান্ধীর একান্ত ঘনিষ্ঠ মহুয়া মৈত্র-এর উদ্যোগ। রাহুল গান্ধী নাকি লোকসভা নির্বাচনে মহুয়া মৈত্রকে চেয়েছিলেন প্রার্থী হিসাবে। কংগ্রেস কী করে প্রার্থী দেবে! তাদেরই প্রার্থী সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অথচ বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিতা মহুয়া মৈত্র কংগ্রেসে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। কিন্তু তাঁকে এ-রাজ্যে কংগ্রেস কোনও কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে না। এই চিন্তন শিবিরের আগেই প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যতম নেতা সুব্রত মুখার্জি বিদেশ চলে গেলেন। তিনি যাবার আগে বলে গেলেন "ফুলটাইম সভাপতি চাই।" চিন্তন শিবিরে কি হলো? প্রণব মুখার্জি এক লম্বা বক্তৃতা করলেন। পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতা কেশবরাও উপস্থিত ছিলেন। চিন্তনে প্রণববাবুর বক্তৃতার সারাৎসার হলো তৃণমূলকে ছেড়ে নির্বাচন করা যাবে না। কারণ মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল গঠন করে কংগ্রেসে যে-ভাঙন এনেছে-তা এখনও পূরণ হয়নি। তিনি আরও বলেছেন, কংগ্রেসকে যথাযথ সম্মান দেখানো হোক। এ যেন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'। কারণ বর্তমানে যে-অবস্থা আছে—সেটা চলতে থাকলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসে আরও বড় ভাঙন ধরবে। তাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন দীপা দাশমন্সি। তিনি বলেছেন, রেলে চাকরির লোভ দেখিয়ে—কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। সেই ক্ষমতার লোভ। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা চান মমতাকে পাঁচ বছর সঙ্গে রাখতে—নতুবা মন্ত্রিসভা পড়ে যাবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যদি পড়ে যায়—তখন ইউপিএ নামক মোর্চাটিও ভেঙে যাবে। কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করে দেবে। চিন্তন শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন শংকর সিং। যিনি মনেপ্রাণে তৃণমূলের আগ্রাসী-রাজনীতির বিরুদ্ধে। রাজ্য-কংগ্রেসে দু'টি মত থাকবে—থাকবে দ্বন্দ্ব। এরপরে উত্তরবঙ্গে তৃণমূল ভীষণভাবে কংগ্রেসে ভাঙন ধরাবে। ক্ষমতার লোভ বড়ই তীব্র। তাই ক্ষমতার মধু যেখানে সেখানেই তো ক্ষমতালোভী মক্ষিকাকুল যাবেনই!

রাজ্য-কংগ্রেসের নিচের তলার সব কর্মী কিন্তু ক্ষমতা-লোভী নন। তাঁরা কেউ কেউ রাজ্যে জাতীয় কংগ্রেস-কে শক্তিশালী করতে চান। তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হবে না। কারণ তৃণমূলকে ছেড়ে দিলে রাজ্য-কংগ্রেসের অস্তিত্বের সংকট দেখা দেবে।

এমন সময় আসবে যখন কংগ্রেসের— যাঁরা তৃণমূল এবং সিপিএম উভয়েরই বিরোধী, তাঁদেরকে জাতীয়তাবাদী আদর্শের রাজনৈতিক পার্টির নিকট আসতেই হবে। প্রসঙ্গত কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যে-অবহেলা এ-রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠন সম্পর্কে দেখাচ্ছেন তাতে কংগ্রেস-সাইনবোর্ড পার্টিতে পরিণত হবার সম্ভাবনা বাতিল করা যায় না।

এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধবাবুর ডানা ছাঁটা নিয়ে অনেক সংবাদ বেরিয়েছে। উল্লেখ করতে চাই, এসব কথা স্বস্তিকা-তে বহু আগেই একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। যেসব কাগজে ডঃ অসীম দাশগুপ্ত-কে বুদ্ধবাবুর পরিবর্ত হিসাবে দেখানো হচ্ছিল তারাই আবার ডঃ অসীম দাশগুপ্তর কাজে ঢিলেমির উদাহরণ তুলে লিখছে, অসীমবাবু হাজার ফাইল ফেলে রেখেছেন। কাজ করেন না। ঘটনা হলো বুদ্ধবাবুকে সরানোর জন্য নানা কথা রাজ্য-কমিটি সভায় বলা হয়। কেউ কেউ বলেন তাঁর কাজ হালকা করা দরকার। কিন্তু সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীরা বুদ্ধ-বিমান-নিরুপম এই ত্রয়ীকে সরাতে চাইছেন। এটা হবে না। কারণ বর্ধমানগোষ্ঠী অটুট। আর এখন বুদ্ধ-নিরুপম অপসারণের বিরুদ্ধে একমত। বিমানবাবুও জানেন—অপসারণ প্রক্রিয়া শুরু হলে কেউ বাদ যাবেন না। সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও পশ্চিমবঙ্গের পার্টি ক্ষমতায় থাকতে পারবে না সেটা বুঝে নিয়েই যা চলছে চলুক কৌশল নিয়েছে। বুদ্ধ বাবু ও নিরুপম-কে পলিটব্যুরোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মোটেই ভালচোখে দেখেন না। আগেই এই কলামে লেখা হয়েছিল—পার্টিসংগঠন বনাম রাজ্য-প্রশাসন দ্বন্দ্ব হচ্ছে। এক কথায় বুদ্ধ-নিরুপম বনাম বিমান। বিমান বসু তার গোষ্ঠীর সুবীর ব্যানার্জিকে (বঙ্গীয় সাক্ষরতা সমিতির সাধারণ-সম্পাদক) দিয়ে রাজ্য-কমিটির সভায় বুদ্ধ-নিরুপমের বিরুদ্ধে কামান দাগিয়েছে। এই সব দেখেই প্রকাশ কারাত-সীতারাম ইয়েচুরি যা হচ্ছে হোক—এই মনোভাব নিয়েছে। রাজ্য-পার্টি নেতৃত্ব পার্টিকে সক্রিয় করার জন্য প্রায় প্রতিদিন জমায়েত, মিছিল বিক্ষোভের কর্মসূচী নিয়ে চলেছে। নেতৃত্বের ধারণা এইভাবেই পার্টিকে সক্রিয় করা যাবে। এদিকে রোজ রোজ রাস্তাজুড়ে কর্মসূচী করার জন্য সাধারণ মানুষের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। ক্রমশ ক্রমশ জমায়েত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। কারণ আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটে জেরবার না-পাওয়া না-খাওয়া 'কমরেডরা' রোজগারেই বেশি করে মনোনিবেশ করছে। পার্টি বসে যাচ্ছে। কারণ নিচের তলার কমরেডদের গোষ্ঠীবাজিতেই লিপ্ত রাখা হয়েছে। আদর্শ-রাজনীতি যে কিছুই শেখানো হয়নি তার কারণ তাতে নিচের তলার কর্মীরা নেতা হয়ে যেতে পারে। তাই নিচের তলার কর্মীদের "ভাড়াটে সৈনিক-মার্সিনারি" হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। নেতারা সব কম্যাণ্ডার—শুধু কম্যান্ডিং মেজাজে থাকেন, শুদ্ধিকরণের ডান্ডা দেখিয়ে দৌড় করান। রাজ্য-কমিটির সভায় পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত বলেছেন, "পার্টির কিছু নেতারা নিজেদের পুত্র কন্যাদের বিবাহে বুর্জোয়াদের মতো ভোজসভার আয়োজন করে থাকেন। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।"

ঠিক এর পরেই হাওড়ার প্রাক্তন সাংসদ স্বদেশ চক্রবর্তীর কন্যার বিবাহে কি হলো? সেখানে নাকি হাওড়ার এক নম্বর প্রমোটার আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন? কারাত সাহেব, বিসমিল্লায় গলদ। মাছের পচন মাথা থেকেই হয়।

সম্প্রতি দেখা গেল পরিবহন দপ্তরে জাল চালান এবং এর ফলে ৪ কোটি টাকা তছনছ। চালানের প্রতিটিতে নাকি সুভাষ চক্রবর্তীর স্বাক্ষর আছে। পরিবহণ দপ্তরের দুর্নীতি জানতে হলে নারায়ণ-মণ্টু সাহাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে। রাজদেও গোয়ালা—প্রলয় দাশগুপ্ত কিছু জানেন কি? সুজিত দাস তো বিতাড়িত। তবে দুর্নীতি বিতাড়িত হলো না কেন?

শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নাকি সমস্ত দপ্তরের দুর্নীতি খুঁজে বের করার জন্য সচিবস্তরে নির্দেশ দিয়েছেন? জাল-কিট-নিয়ে তদন্ত হোক—কেন এ-ব্যাপারে তৃণমূল নেতারা চুপচাপ? তাঁদের কি এতে জড়িতদের সঙ্গে সংযোগ আছে? সিপিএম-এর একটি রাজ্য-সম্মেলনে গোবিন্দ সারদাদের কারখানার গেস্ট-হাউস ব্যবহার করা হয়েছিল। শোনা যায়, এই সারদাদের কেউ নাকি জাল-কিটের সঙ্গে জড়িত? তবে তৃণমূল বা বিরোধীদল এস ইউ সি চুপ থাকে কেন?

সিপিএম-এর কয়েকটি জেলা কমিটির সম্পাদক পরিবর্তনের কথা উঠেছে। কলকাতায় চিত্তব্রত মজুমদারের ভাইপো কল্লোল মজুমদারকে, উত্তর ২৪ পরগণায় অমিতাভ নন্দীকে, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ডঃ সুজন চক্রবর্তীকে, হাওড়াতে বিপ্লব মজুমদারকে এবং হুগলিতে অনিল বোসকে জেলা-সম্পাদক করার দাবী উঠেছে। আর পশ্চিম মেদিনীপুরের দীপক সরকারকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে নেবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ঘটনা হলো, সর্বাঙ্গে ঘা, মলম লাগাবেন কোথায়?

> **"প্রণববাবুর বক্তৃতার সারাৎসার হলো তৃণমূলকে ছেড়ে নির্বাচন করা যাবে না। কারণ মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল গঠন করে কংগ্রেসে যে-ভাঙন এনেছে-তা এখনও পূরণ হয়নি। তিনি আরও বলেছেন, কংগ্রেসকে যথাযথ সম্মান দেখানো হোক। এ যেন 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি'।"**

অন্য রকম

বংশীবদন

এই বংশীবদন বাঁশি বাজান না। ঢোল আর তবলার মাঝামাঝি কিছু একটা বাজান। অসমীয়া ভাষায় যে বাজনা-কে বলা হয় 'পিপা'। যাঁরা এই অসমীয়া 'পিপা'-র সাথে পরিচিত নন তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখা যাক যে 'পিপা' হলো আসামের একটি ঐতিহ্যশালী বাদ্যযন্ত্র। ঠিকই ধরেছেন, এই বংশীবদন একজন অসমীয়া। নাম আনন্দ গগৈ। যার নাম আনন্দ তাকে খামোকা বংশীবদন বলে ডাকা হচ্ছে কেন? কারণ আছে মশাই! এই মাল্লিগণ্ডার বাজারে সংসার চালানোই যেখানে দায় সেখানে যতবড় সঙ্গীত সাধক-ই হোক আস্ত একখানা সংসার চালিয়ে তার ওপর বিস্তর খরচাপাতি করে গোটা একটা পিপা কিনে তা বাজাতে হলে তার দেখতে হবে না! এখন 'পিপা'র দাম চড়া কেন তার তত্ত্ব-তালাশ আগে করা যাক। পিপা তৈরি হয় মোষের সিং দিয়ে। এই মোষের সিং আজকাল আর তেমন সহজলভ্য হচ্ছে না। কারণ প্রথমত, গো-হত্যা বন্ধে জনসচেতনতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই মোষের সিং-এর আকাল দেখা দিচ্ছে। একমাত্র মোষের মৃত্যুর পরই তার সিং পাওয়া যাচ্ছে। আর এর দ্বিতীয় কারণটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, সঙ্গীতের মতো একটি অন্তরের অন্তস্থলে বিরাজিত সত্য-সুন্দর বিষয়ের সঙ্গে গো-হত্যার মতো পৈশাচিক ঘটনা সংঘটিত করার মাধ্যমে এর বাজনা (অর্থাৎ পিপা) তৈরির ব্যাপার-স্যাপার একদমই না-পসন্দ ছিল ওখানকার সঙ্গীত শিল্পীদের। সঙ্গীতশিল্পীদের এই ব্যাথাটা সত্যিই অনুভূত হচ্ছিল অসমের শিবাসাগর জেলার নিতাইপুখুরীর বাসিন্দা আনন্দ গগৈ-এর। সুতরাং 'পিপা'-র কাঁচামাল হিসেবে মোষের সিং-এর পরিবর্তে আর কি ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া সহজলভ্য হতে পারে? এমন সময় তাঁর মাথায় আসে বাঁশের ব্যাপারটি। সেই সময় বাঁশ দিয়ে 'পিপা' তৈরির প্রচেষ্টা আনন্দের আশপাশের লোকজনের কাছে নেহাতই এক অবাস্তব, অকল্পনীয় এবং অবিশ্বাস্য কাণ্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই ঘটনাটি আজ থেকে প্রায় বছর ছয়েক আগেকার। এরপর ব্রহ্মপুত্র দিয়ে বিস্তর জল গড়িয়ে গেছে। এবছর ডিব্রুগড়ের গান্ধী শিল্পী মেলায় প্রদর্শিত হয়েছে আনন্দ গগৈ-এর 'মোহর সিঙ্গার পিপা' যা নির্মিত হয়েছে বাঁশ দ্বারা। আর এর দামও হয়েছে বেশ সস্তা। সম্প্রতি ঢোল এবং খোলও তিনি তৈরি করেছেন। যেটাকে একঝলক দেখলেই একটু অন্যরকম মনে হতে বাধ্য।

হ্যাঁ ওটাও তৈরি হয়েছে বাঁশ দিয়ে। এরপরে বাঁশ দিয়ে ডুগি-তবলা তৈরিরও ইচ্ছে আছে তাঁর। এতদিনে প্রমাণ হয়েছে, আনন্দ গগৈ-এর বাঁশে তৈরি জিনিসপত্রের দাম যেমন সস্তা তেমনি টেঁকসই। সেই কারণে তাঁর সৃষ্টির প্রচুর সমাদর ও চাহিদা—দুই-ই আছে এখন। বংশ অর্থাৎ বাঁশ নিয়ে যার এত কারবার তিনি বংশীবদন হবেন না? কি যে বলেন!

বাদ্যযন্ত্র সহ আনন্দ গগৈ।

চট্টগ্রামে চাকমা শান্তি চুক্তি

বারো বছর বাদেও সমস্যার সমাধান হয়নি

সোহরাব হাসান

'মৃত্যুর সঙ্গে যুঝে চলেছি নিরন্তর।
পৃথিবীর বুক থেকে নিজেদের
মুছে যেতে দেব না কিছুতেই;
আকাশের কোণে
ভোরের তারার শেষ আভাটুকু জ্বলবে
যতক্ষণ।'

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী গুয়াতেমালার নারীনেত্রী রিগাবার্ত মেঞ্চু এভাবেই আদিবাসীদের দুঃখ-বেদনার কথা উচ্চারণ করেছিলেন তার আত্মজীবনীতে। শুধু গুয়াতেমালা নয়, পৃথিবীর সব দেশের অদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিরন্তর যুদ্ধ করে বেঁচে থাকতে হয়। পনেরো কোটি জন-অধ্যুষিত এই বাংলাদেশের পাহাড়ে ও সমতলে যেসব আদিবাসী আছেন তারা শত শত বছর ধরে বঞ্চ না ও বৈষম্যের শিকার। বরাবর তারা নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে আছেন।

অথচ সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী, শাসকবর্গ কখনই তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেনি। ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেও আদিবাসীরা অধিকার হারা। বাহাত্তরে রচিত সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়। অথচ তাতেও ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর স্বীকৃতি নেই।

গত শতকের সাত ও আটের দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তারও মূলে ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বঞ্চ না। তাদের রাজনৈতিক সংগ্রাম দীর্ঘদিনের। পনের শতকে যাযাবর চাকমা জনগোষ্ঠী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। পরে মুরং, ম্রো, বম ও ত্রিপুরা সহ অন্যান্য আদিবাসীও তাদের বসতি গড়ে তোলে। তারা বরাবরই ছিল স্বাধীনচেতা। অন্যের অধীনতা মেনে নেয়নি। আঠার শতকে বৃটিশ শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রাম দখলে নিলে আদিবাসীরা প্রতিবাদ জানায়। এর আগে মোঘলদের দখলদারিত্ব তারা মেনে নেয়নি। ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি জারি করে যাতে বিশেষ অঞ্চ ল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও (৯৫ শতাংশ) পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পাহাড়িদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিল। ১৯৬৩ সালে কাপ্তাই বাঁধ চালু হলে হাজার হাজার আদিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়। অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়, অনেকে উদ্বাস্তু জীবন যাপন করে। পাহাড়িদের দুঃখ-কষ্টের শুরু সেখান থেকেই। পরে পাকিস্তান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবর্তিত বিশেষ শাসনবিধিও বাতিল করে দেয়। আশা করা গিয়েছিল স্বাধীনতার পর 'বাঙালী' শাসকরা তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মেনে নেবেন। বাস্তব ছিল ঠিক তার বিপরীত। ১৯৭২ সালের গণপরিষদে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একমাত্র প্রতিনিধি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে দেখা করে চার দফা দাবী পেশ করেছিলেন। দাবীগুলো হলো—

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চ ল।

২। ১৯০০ সালের শাসনবিধি সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। আদিবাসী রাজ্য ও হেডম্যানরা অবশ্যই বহাল থাকবেন।

৪। সংবিধানে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে ১৯০০ সালের বিধিসমূহ রদবদল করা হবে না।

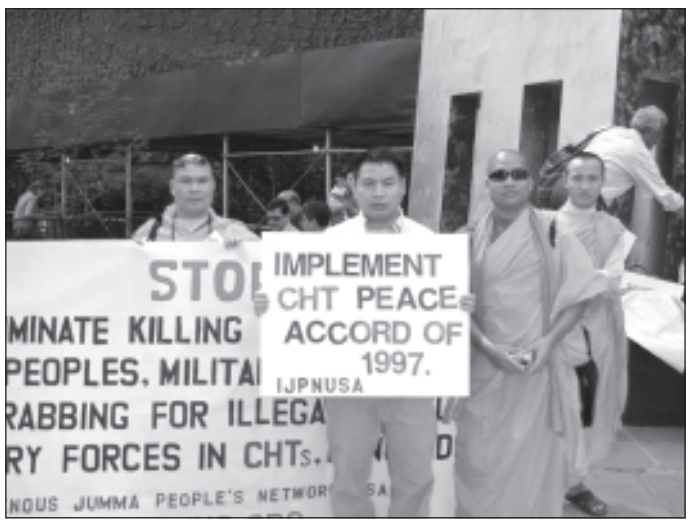

শান্তিচুক্তি রূপায়ণের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন।

'আমি যে অঞ্চ ল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে। বাংলাভাষায় বাঙালীদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে এসেছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ-দাদা চৌদ্দগোষ্ঠী—এখানে ভূমিপুত্র।'

কিন্তু গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসা বাঙালী শাসকগোষ্ঠী কয়েক লাখ পাহাড়ি জনগণের দাবী শুধু অগ্রাহ্যই করেনি, সংবিধানে বাংলাদেশের নাগরিকদের একমাত্র বাঙালী পরিচয় দিয়ে তাদের জাতিসত্ত্বাকেও নাকচ করে দেয়। এতে অন্যান্য আদিবাসীর ন্যায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীও ক্ষুব্ধ হয়। মানবেন্দ্র লারমা গণপরিষদ ও জাতীয় সংসদে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানান। ১৯৭২ সালের ২১ অক্টোবর—যে দিনটিতে সংবিধানের এ সংক্রান্ত ধারাটি পাশ হয় সেদিন তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলেন—

পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় জনসংহতি সমিতি, মানবেন্দ্র লারমা হন এর সভাপতি। পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন কেবল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্রই বদলে দেয় না, পাহাড়িদেরও ফেলে দেয় এক অনিশ্চি ত যাত্রায়। '৭৫-এর ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত জনসংহতি সমিতি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। ১৬ আগষ্ট মানবেন্দ্র লারমা সমর্থকদের নিয়ে আত্মগোপনে চলে যান।

তিনি বুঝতে পারছিলেন, বাঙালী জাত্যাভিমানের সঙ্গে বোঝাপড়া করা গেলেও সামরিক শাসকের দৌরাত্ম্য ঠেকানো যাবে না। অতএব তারা সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেছে নিলেন। গঠিত হলো জনসংহতি সমিতির সামরিক শাখা—'শান্তিবাহিনী'।

পরবর্তী ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা। প্রায় দুই দশক ধরে পাহাড়ে চলেছে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ, রক্তের ধারায় সিক্ত হয়েছে সবুজ বনভূমি, শস্য ক্ষেত পরিণত হয়েছে রণাঙ্গনে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল বারুদের গন্ধে, সেনার অত্যাচারে। নানা অভিযান, অপারেশন ব্যর্থ হওয়ার পর শাসকদের বোধোদয় ঘটে। তারা শান্তির প্রক্রিয়া শুরু করতে আলোচনায় বসেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বদানকারী জনসংহতির সঙ্গে। অবশেষে বহু প্রাণ হরণ ও রক্তপাতের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর।

তখন ক্ষমতায় ছিল আওয়ামী লীগ। তবে পূর্ববর্তী সরকারগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার সরকারের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে শান্তি প্রক্রিয়া গতি পায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে তিন জনপ্রতিনিধিই ছিলেন আওয়ামী লীগের। ফলে তারা সরকার ও জনসংহতির মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেন। শান্তিচুক্তির আগে জনসংহতি সমিতির শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে জিয়া সরকার তিন দফা, এরশাদ সরকার পাঁচ দফা, খালেদা জিয়া সরকার সাত দফা ও শেষ হাসিনা সরকার ছয় দফা বৈঠক করেছে।

২ ডিসেম্বর ২০০৯। পার্বত্য শান্তিচুক্তির ১২ বছর পার হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে এ চুক্তির মধ্য দিয়ে কী অর্জন করেছে রাষ্ট্র? কী পেয়েছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী? শান্তিচুক্তির

(এরপর ৭ পাতায়)

পুলিশ-প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ

ত্রিপুরায় অবাধে চলছে গাঁজার চাষ

সংবাদদাতা, সোনামুড়া ঃ কৃষিপ্রধান সোনামুড়া মহকুমার এখন প্রধান ফসল গাঁজা। প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে গোটা মহকুমায় এ বছর সহস্রাধিক হেক্টর টিলা এবং লুঙ্গা জমিতে গাঁজা চাষ করেছে চাষীরা। প্রশাসনিক কর্তারা। উদ্ধারকৃত গাঁজার সামান্য অংশ থানায় জমা দিয়ে গাঁজা ব্যবসায় সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েছে খোদ কিছু পুলিশ অফিসারও। সোনামুড়ার কোন গ্রামে কত জমিতে গাঁজা চাষ হয়েছে পুলিশের উপর

দুর্গম এলাকার সীমা ছাড়িয়ে এ বছর বড় রাস্তার পাশেও গাঁজা চাষ করেছে চাষীরা। মাসিক হপ্তার বিনিময়ে পুলিশ, সীমান্তরক্ষী গোয়েন্দা দপ্তর, শুল্ক দপ্তর সবাই দেখেও চাষীদের পরোক্ষভাবে গাঁজা চাষ করার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। হপ্তা নেওয়ার পরও চাষীদের গাঁজার মজুতে ভাগ বসাচ্ছে মহলের কাছে সংবাদ থাকা সত্ত্বেও গাঁজা বিরোধী অভিযান বন্ধ রেখেছে প্রশাসনের সমস্ত দুর্নীতি দমন শাখা। একদিকে বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে, সব্জির ফলন হ্রাস পাচ্ছে, গাঁজা গাছ রক্ষায় পাড়ায় পাড়ায় অস্ত্রের মজুত বাড়ছে, অন্যদিকে মানুষের নৈতিক অধঃপতন হচ্ছে। তারপরও প্রশাসন শাসকদলীয় নেতা-মন্ত্রীদের চাপের মুখে হাজার হাজার গাঁজা চাষীকে অবাধে গাঁজা চাষ করার জন্য প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে।

দ্রুত অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে হয়তো সরকার গাঁজা চাষের প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। কিন্তু এর ফলে যে দ্রুত সামাজিক অধঃপতন হচ্ছে বা উদ্বেগজনকভাবে অপরাধমূলক ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেদিকে নজর দিচ্ছে না প্রশাসন। দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ী এলাকার প্রতিটি গ্রামে কোটি কোটি টাকার গাঁজা উৎপাদন হচ্ছে। সে গাঁজা গাছ যাতে প্রশাসন ধ্বংস না করতে পারে, তার জন্য রহিমপুর, কলমচৌরা, কমলনগর, বাতাদোলা, রামপদ পাড়া, ধনীরামপুর, পাঁচনালিয়া, ময়নামা, আড়ালিয়া, তেজিলিং, শিবনগর, জুমেরডেপা, লক্ষ্মণডেপা, আনন্দপুর, তেলকাজলা, চণ্ডিগড়, দশরথবাড়ী, থলীবাড়ী, তৈবান্দাল, মনাইপাথর, কালীখলা সহ আরও বহু গ্রামে এবছর ব্যাপকভাবে গাঁজা চাষ করেছে চাষীরা। গাঁজা বিরোধী অভিযান না থাকায় সাধারণ চাষীদের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী, ব্যবসায়ী, সীমান্ত এলাকা কালোবাজারী, ক্ষমতাশালী নেতা, ঠিকাদার, শিক্ষিত বেকার সহ সমাজের প্রায় সকল অংশের লোক সম্প্রতি গাঁজা চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর পূর্বেও গাঁজার চাষ, গাঁজা ব্যবসা, গাঁজা পাচার লজ্জার বিষয় ছিল এবং তা গোপনে করা হোত। সম্প্রতি গাঁজা চাষ গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের প্রশ্রয়ের কারণে সহজে কোটিপতি হওয়ার নেশায় নৈতিকতা আত্মবিসর্জন দিয়ে সমাজের নামীদামী মানুষও গাঁজা চাষের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে সোনামুড়ার উত্তরাঞ্চ লের কিছু স্কুল শিক্ষক জানান, তাদের বহু সহকর্মী স্কুল কামাই করে সারাদিন গাঁজা চাষ করতে ব্যস্ত থাকে। স্কুলের ছাত্রদের উপস্থিতির হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

গত বছর উনিশ জানুয়ারি বক্সনগরের দুপুরিয়াবান্দ এলাকায় গাঁজাবিরোধী অভিযানে গিয়ে বি এস এফ বনাম গাঁজা চাষীদের সংঘর্ষে তিনজন নিহত এবং চারজন আহত হওয়ার পর রাজ্যের শাসকদলের চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন। তারপর থেকেই কোনও ঝুঁকি নিয়ে গাঁজাবিরোধী অভিযানে বের হয়নি বি এস এফ কিংবা অন্যান্য দুর্নীতি দমন শাখা। মাঝেমধ্যে দু-চারজন অফিসার লোক দেখাতে অভিযানে গিয়ে কয়েকটি গাঁজা গাছ কেটে হাজার হাজার গাঁজা গাছ কাটার রিপোর্ট পাঠায় পুলিশের ওপর মহলে।

সোনামুড়া থানার পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলে জানা যায়, ত্রিশ কেজি নয়, তারা মাত্র বারো কেজি গাঁজা এনেছে বাতাদোলা এবং বিজয়নগর গ্রাম থেকে। গ্রামবাসীরা বলতে পারছে না বাকি আঠারো কেজি গাঁজা গেল কোথায়!

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক সংবাদ)

ছোট রাজ্যের তত্ত্ব মেনেই তেলেঙ্গানায় সায় কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম জানিয়ে দিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গড়ে তুলতে চাইলে তাতে কোনও আপত্তি করবে না কংগ্রেস। কিন্তু এই গড়ে তুলতে চাওয়ার প্রশ্নে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার আড়াআড়ি ভাবে বিভাজন হয়ে গেছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার ১৩৪ জন বিধায়ক তাঁদের পদত্যাগপত্র স্পীকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই বিধায়কদের মধ্যে ৮০ জনই কংগ্রেসের। এছাড়াও চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টির ৪০ জন এবং প্রজা রাজ্যম পার্টির ১৪ জন বিধায়ক রয়েছেন। এঁরা প্রত্যেকেই বলছেন, তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠনে কোনওমতেই মদত দিতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে নতুন করে চাপে পড়ল দিল্লীর কংগ্রেস সরকার।

স্রেফ রাজনৈতিক কারণবশত এবার লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে এরাজ্যের গোর্খাল্যাণ্ড করার ব্যাপারে বঙ্গভঙ্গ-এর ধুয়ো তুলেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেস সরাসরি বলেছে তারা ছোট রাজ্যের দাবী মানে না। এনিয়ে বিজেপির বক্তব্য, ছোট রাজ্য গঠন মানে তা দেশবিরোধী কোনও কাজ নয়। বরং প্রশাসনিক সুবিধার দিক দিয়ে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক সুবিধার্থে ছোট রাজ্য গঠন প্রকারান্তরে দেশ শাসনেরই উপযোগী হবে। বিজেপি-র এই দাবী যে কোনও ফাঁকা আওয়াজ ছিল না তা এতদিনে বোধহয় স্পষ্ট করে দিলেন কংগ্রেসের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরম।

বলা যেতে পারে, টি আর এস প্রধান-কে চন্দ্রশেখর রাও-এর প্রবল চাপের কাছে একপ্রকার নতিস্বীকার করেই নিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রায় এগারো দিন ধরে তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবীতে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন চন্দ্রশেখর রাও। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য জুড়ে টি আর এস কর্মীরা ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সব মিলিয়ে রাও-এর যদি কিছু হয়ে যায় এবং তার প্রতিক্রিয়ায় জনমানসে কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে শুধুমাত্র এই চিন্তাতেই শঙ্কিত হয়ে মনমোহন সরকার তেলেঙ্গানা দাবীর প্রতি একপ্রকার সম্মতিই জানিয়ে দিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় আদৌ পাশ হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট জটিলতা তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যেই। কারণ প্রস্তাবিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের মধ্যে বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের ২৩টির মধ্যে ১০টি জেলা রয়েছে। ২৯৪ বিধানসভা আসনবিশিষ্ট অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভার মধ্যে ১১৯টি রয়েছে প্রস্তাবিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের মধ্যে। সুতরাং বাকি ১৭৫ জন বিধায়কদের মধ্যে কতজন বিধায়কের সমর্থন এব্যাপারে পাওয়া যাবে তাও নিশ্চিত নয়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নটাও তাই উঠে আসছে যে সবকিছু বুঝেশুনেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তেলেঙ্গানা নিয়ে একটা ভাঁওতা দেয়নি তো? এই ভাঁওতাবাজি করার বেশ কতকগুলি যুক্তিগ্রাহ্য কারণও রয়েছে। প্রথমত, তেলেগু দেশম ও বামেরা প্রথমদিকে 'তেলেঙ্গানা'র বিরুদ্ধে থাকলেও পরে তাদের জনসমর্থনের ভিত ক্রমশই আলগা হচ্ছে বুঝে তেলেঙ্গানা রাজ্যের পক্ষে মত দেয়। চিরঞ্জীবীর প্রজারাজ্যমও এতে অংশগ্রহণ করে। আর বিজেপি-তো বরাবরই ছোট রাজ্য গঠনের পক্ষে। এদিকে ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির মৃত্যুর পর অন্ধ্রের কুর্সির দখল নিয়ে তাঁর ছেলে জগনমোহন ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মনোমালিন্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। রোসাইয়া-কে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী করার পর থেকেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও তার ফলস্বরূপ কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকে। সেই কারণে হারানো জনপ্রিয়তা একপ্রকার পুনরুদ্ধার করতে এবং এর সঙ্গে নিজের 'তেলেঙ্গানা বিরোধী' তকমাও ঝেড়ে ফেলতে কংগ্রেস নেতৃত্ব সচেষ্ট হয়েছেন বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।

দ্বিতীয়ত, অন্ধ্রপ্রদেশের অধুনা রাজধানী হায়দরাবাদে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে। এমনকী সর্বভারতীয় ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যেরা সেখানকার অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই এবং সিপিএমের এস এফ আই-কে গোহারা হারিয়েছে। প্রস্তাবিত তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী হবার কথা এই হায়দরাবাদেরই। সেখানকার মানুষের এই জাতীয়তাবাদী মানসিকতা বুঝেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য কংগ্রেস এরকম ভাঁওতার আশ্রয় নিয়েছে—এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জি কে পিল্লাই স্বীকার করেই নিয়েছেন যে হায়দরাবাদ সব সময়েই তেলেঙ্গানার রাজধানী। তৃতীয়ত, একদিকে সনিয়া-মনমোহন যেমন তেলেঙ্গানার পক্ষে ঘোষণা করছেন, অন্যদিকে রাজশেখর পুত্র জগনমোহন এবং কে এস রাও তেলেঙ্গানা বিরোধী নেতাদের উস্কে দিয়ে রাজ্য জুড়ে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। তাতে দেখানো যাবে যে—তেলেঙ্গানা নামক রাজ্য গড়তে গেলে কত নতুন অশান্তির সৃষ্টি হবে, তার চাইতে তেলেঙ্গানা না হওয়াই ভাল!

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে তিরুপতিতে বাসে আগুন।

এমনিতে নিজামের হায়দরাবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তেলেঙ্গানার ১৯৪৮ সালে ভারতে অন্তর্ভুক্তিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি না দেখালেও ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত কারণে ভারতবর্ষের দক্ষিণে মাদ্রাজ রাজ্যের অঙ্গীভূত হতে বরাবরই আপত্তি ছিল সেখানকার মানুষজনদের। এদিকে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দাবীতে সেখানকার সর্বজনমান্য নেতা পোট্টি শ্রীরামালুর অনশনের ঠেলায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অন্ধ্রপ্রদেশের দাবী মেনে নেন। এরপর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক হতে চেয়ে তেলেঙ্গানার দাবী নিয়ে বিদ্রোহ দানা বাঁধে ১৯৬৯ সালে, চেন্না রেড্ডির নেতৃত্বে। যে বিদ্রোহের অভিঘাতে ঝরে যায় ৩৫০টি তাজা প্রাণ। তবু সেদিন সেই দাবী মানেননি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর উত্তরপুরুষরা কি সেই পাপ স্খালনের আদৌ কোনও চেষ্টা করবেন নাকি ভাঁওতাবাজিকেই অন্ধের যষ্টি করে দিনগত পাপবৃদ্ধি করবেন?—এই প্রশ্নটারই মীমাংসা চাইছেন তেলেঙ্গানা-বাসী।

চট্টগ্রামে চাকমা শান্তি চুক্তি

(৬ পাতার পর)

প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গৃহযুদ্ধের অবসান। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে চুক্তির উদ্দেশ্য অনেকটাই সফল হয়েছে। এখন সেখানে আর যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে না। কেউ কারও প্রতি অস্ত্র তাক করছে না। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সেখানেও মানুষ অবাধে চলাচল করতে পারছে। বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন। এখন আর পার্বত্য চট্টগ্রামে বাড়তি সেনা, বাড়তি অস্ত্র ও বাড়তি রসদ পাঠাতে হচ্ছে না। সামরিক খাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য বাড়তি বরাদ্দেরও প্রয়োজন নেই। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি যা অর্জন করেছে তাও কম নয়। চুক্তির কয়টি ধারা বাস্তবায়িত হয়েছে, কয়টি হয়নি।

পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বিশেষ করে জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে বার বার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, তারা সরকারের নীতিনির্ধারকদের সঙ্গেও বৈঠকে বসছেন। তারপরও আশার কথা যে, ধীরে ধীরে হলেও পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর প্রতি 'বাঙালী' শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে শুরু করেছে। ১৯৯৭ সালে চুক্তি স্বাক্ষরের পর তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার যতটা নিষ্ক্রিয় মনোভাব দেখিয়েছিল এখন তা নয়।

নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী পার্বত্য শান্তিচুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলোর বাস্তবায়নেও কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। অস্থায়ী সেনা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের নির্বাচনেরও প্রস্তুতি চলছে। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, ১৯৯৭-২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে প্রবল রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল এবার তা নেই বললেই চলে। এখন আর কেউ দাবী করেন না, শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অংশ হয়ে যাবে। বি এন পি-জামায়াত বিরোধী দলে থাকার সময় শান্তিচুক্তি বাতিলের দাবী জানিয়েছিল। ক্ষমতায় গিয়ে তারা চুক্তি বাতিল করেনি বরং ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মোবাইল ফোন চালু করে এ অঞ্চলের মানুষের প্রতি রাষ্ট্র যে দীর্ঘদিন অন্যায় আচরণ করে আসছিল তা বন্ধ করেছে। এই পদক্ষেপ সরকারের প্রতি পাহাড়িদের আস্থা ও বিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি সেখান থেকে অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের ঘোষণায় বি এন পি-জামায়াত সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদ করলেও কণ্ঠে তেমন জোর নেই, যেখানে রাষ্ট্রের চোখে সব নাগরিক সমান সেখানে একটি অঞ্চলে অঘোষিত সামরিক শাসন থাকবে কেন? গৃহযুদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের অজুহাতেই পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছিল, পাঠানো হয়েছিল বাড়তি সেনা। এখন যুদ্ধ নেই। শান্তিবাহিনী নেই। চোরাগোপ্তা হামলা নেই। তাহলে অস্থায়ী ক্যাম্প কেন? অনেকে যুক্তি দেখাচ্ছেন, সেনাক্যাম্প তুলে নেওয়া হলে সীমান্ত অরক্ষিত থাকবে। কেন? সেখানে বি ডি আর আছে। তিন-তিনটি ক্যান্টনমেন্ট আছে। সীমান্ত রক্ষার জন্য তারাই যথেষ্ট।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সময় পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর এক অংশ এর বিরোধিতা করেছিল। পরবর্তীকালে তারা ইউ পি ডি এফ নামে একটি সংগঠনও গড়ে তোলে। তাদের আশঙ্কা ছিল সরকার চুক্তি করলেও বাস্তবায়ন করবে না। চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়িত করেই প্রমাণ করতে হবে তাদের আশঙ্কা অমূলক ছিল। সমগ্র পাহাড়ী জনগণের অস্তিত্বের প্রশ্ন যেখানে জড়িত সেখানে তাদের মধ্যে কোনও বিভাজন বা বিরোধ কাম্য নয়।

কূটতর্কে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। সন্দেহ ও ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়েছে চুক্তি-বিরোধীরা। এখন সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, আঞ্চলিক পরিষদ—সবারই মনোযোগী হওয়া উচিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন তথা সেখানকার মানুষের জীবনের মানোন্নয়নে।

(দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

জঙ্গীদের মদতদাতা কেরলের সি পি এম সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার দক্ষিণ ভারতীয় কম্যাণ্ডার থাদিয়ান্তাভিদ নাজের ও তার দলবলের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগের কথা অকপটে স্বীকার করে নিয়েছেন কেরলের ইসলামপন্থী নেতা ও পিডিপি চেয়ারম্যান আব্দুল নাসের মাদানী। শুধু তাই নয়, ইসলামিক সেবক সঙ্ঘের সঙ্গেও তার যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেননি তিনি। তবে তিনি বলছেন, একটা সময় এই সম্পর্ক ছিল, বর্তমানে নেই। একইসঙ্গে মাদানী এটাও জানাচ্ছেন, লস্কর-এ-তৈবার উচ্চপদস্থ কম্যাণ্ডার বাসারের সঙ্গেও সেই সময় তাঁর যোগাযোগ ছিল।

একসঙ্গে মাদানী ও বিজয়ন।

কেরলের কোঝিকোডের একটি আয়ুর্বেদিক হাসপাতালে নিজের চিকিৎসার প্রয়োজনে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মাদানী অভিযোগ করেন, গত লোকসভা নির্বাচনে তাঁর পার্টি সি পি এমের সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ায় এখন কংগ্রেস নেতারা নাকি চাইছেন তাঁর নামের সঙ্গে কোনও অস্তিত্বহীন জঙ্গিসূত্রকে জড়িয়ে দিতে। মাদানীর দাবী, অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডকে তিনি সবকিছু খোলাখুলি ভাবে জানিয়েছেন এবং এখনও যে কোনও রকম তদন্তের জন্য তিনি প্রস্তুত।

মাদানীর বক্তব্য, নাজের তার কাছে স্বল্পপরিচিত একজন ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল কন্নুরে। তবে নাজেরের নাকি পিডিপি-র সঙ্গে কোনও যোগ নেই। এই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই মাদানীর স্বীকারোক্তিটি নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। তাঁর স্বীকারোক্তি — "নাজের আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগও ছিল। সে গণতান্ত্রিক পন্থা ও জাতীয় রাজনীতির বিরোধী ছিল। সুতরাং এ নিয়ে তাকে আমার মতপার্থক্যের কথা জানালাম। আমাদের অধিকাংশ কথাবার্তাই শেষপর্যন্ত পারস্পরিক মতপার্থক্যে পর্যবসিত হয়।" মাদানীর প্রতিশ্রুতি— নাজেরকে আর দ্বিতীয়বার পিডিপি-র মঞ্চে দেখা যাবে না।

সেদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মাদানীর আরও একটা স্বীকারোক্তি রীতিমতো চাঞ্চল্যকর। মাদানী বলেছেন, ইসলামিক জঙ্গি ছাত্র সংগঠন সিমি-র জাতীয় সভাপতি থাকাকালীন বসিরের (যিনি বর্তমানে লস্কর-এ-তৈবার এক উচ্চপদস্থ কম্যাণ্ডার) সঙ্গে একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, অযোধ্যায় কাঠামো ধ্বংসের ঠিক আগের দিন কোঝিকোডে মানানচিরা এলাকায় একটি বিক্ষোভ সমাবেশে এই ঘটনাটি ঘটে।

মাদানী যতই তাঁর সঙ্গে রাজ্যের শাসক দল সি পি এমের সখ্যতার বিষয়টি তুলে ধরতে চান না কেন, এ নিয়ে সি পি এম যে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে তা আর গোপন থাকছে না। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন এবং গৃহমন্ত্রী কোদিয়ারী বালাকৃষ্ণণ পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। মাদানীর মামলাটি যিনি দেখছেন, সেই টমিন জে থ্যাকানকেরি (কন্নুর পুলিশের আই জি)-কে তদন্তের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরে পাঠিয়েছিলেন বালাকৃষ্ণণ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন সরাসরি সেকথা অস্বীকার করে বলেছেন, সরকার কন্নুরের আই জি-কে কোথাও যাবার নির্দেশ দেয়নি। তাই এব্যাপারে আমাদের কোনও দায় নেই।

সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সন্ত্রাসবাদী নাজির এবং মাদানীর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছেই আর তার মদতদাতা রাজ্যের সি পি এম সরকার।

বিজয়নগর ও হিন্দু সংস্কৃতি

ডঃ প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায়

চতুর্দশ শতকে সুলতানি রাজত্বকালে ইসলামের অপ্রতিরোধ্য গতি ও প্রভাবকে প্রতিরোধ করতে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান, ঐতিহাসিক পটভূমিতে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সুলতানী শাসনের অত্যাচারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মধ্যেই এই সাম্রাজ্যের উৎপত্তির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দে জালালউদ্দিন আহশান শাহের বিদ্রোহ-ই স্বাধীন মাদুরা অঞ্চলের উৎপত্তির কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলই পরবর্তী এক বছর পরে মহম্মদ-বিন-তুঘলক-এর রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীস্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যে ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য নামে পরিচিত হয়। এবং প্রায় ৩০০ বছর ধরে মুসলমান আক্রমণ থেকে দাক্ষিণাত্যের রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর রাজ্য দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বরঙ্গলের কাকতীয় বংশোদ্ভূত রাজা প্রতাপরুদ্র দেব-এর অধীনে কর্মরত দুই ভাই হরিহর ও বুক্কর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় তুঙ্গভদ্রা-এর তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই রাজ্য পরবর্তীকালে হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের ধারক ও বাহক হিসাবে বহু পর্যটক ও ঐতিহাসিকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। সুলতানী যুগের অন্যতম দুই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইসামী ও বারানীর বর্ণনা অনুসারে হরিহর ও বুক্ক পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করেছিলেন। তবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উৎপত্তি বিষয়ে বিতর্ক যা-ই থাকুক না কেন, হরিহর ও বুক্ক দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ও সংস্কৃতিকে মুসলমান আক্রমণ থেকে রক্ষাকল্পে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হিন্দু শাসনাধীন বিজয়নগর সাম্রাজ্য সাহিত্য, শিল্পে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। বিজয়নগরের নরপতিরা স্বয়ং শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কন্নড় ভাষা তাঁদের আনুকূল্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন ও তাঁর ভাই মাধব বিদ্যারণ্য-বুক্কর শাসনকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। তুলুভ বংশীয় রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে) স্বয়ং একজন কবি ও লেখক এবং তেলেগু ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তিকে অর্থ ও ভূমিদান করে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর রাজত্বকালেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দাক্ষিণাত্যে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহ্যের নয়নাভিরাম পরম্পরায় বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মতো কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভায় 'অষ্টদিগ্‌গজ' নামে আটজন পণ্ডিত উপস্থিত থাকতেন। নৃত্য-গীত নাটকের মতো সংস্কৃতি-চর্চার বিষয়ে রাজা-মন্ত্রীগণ বিভিন্নভাবে উৎসাহ দান করতেন। কৃষ্ণদেব রায় রচিত 'আমুক্ত মাল্যদা' ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। তাই ঐতিহাসিক কালীকিঙ্কর দত্ত বলেছেন, "The Vijoynagar Empire

রাজা কৃষ্ণদেব রায়

was a synthesis of South Indian Culture."

স্থাপত্যশিল্পেও বিজয়নগর দাক্ষিণাত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল বিজয়নগর-এর স্থাপত্য-রীতি ছিল। স্বতন্ত্র; বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত বিজয়নগরের চিত্রশিল্প ও স্থাপত্য যে বিস্ময়কর ছিল—তা বিদেশী পর্যটকরাও স্বীকার করেছেন। ডঃ এস. কে. সরস্বতী বলেছেন, 'দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্যশিল্প এক উন্নত ধারার নিদর্শন হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ।' উচ্চস্তরের শিল্পসুষমা-সমন্বিত প্রাসাদসমূহ বিষয়ে ডঃ এস. কে. সরস্বতী মন্তব্য করেছেন, চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যশিল্প উভয়েরই অন্নভকরণ অত্যন্ত শিল্পরীতিসম্পন্ন ছিল। পর্যটক পায়েজ (PAEZ) বিজয়নগরের সৌন্দর্যকে রোমের সৌন্দর্য্যের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বিজয়নগর-এর দরবার হলকে "House of Victory" বলে উল্লেখ করেছেন। অপর এক পর্যটক রজ্জাকও বিজয়নগরের উন্নতমানের দরবার হলের প্রশংসা করেছেন।

হিন্দু স্থাপত্যরীতির ধারক ও বাহক বিজয়নগরের শিল্পসৌন্দর্যে অপর এক স্বতন্ত্র ধারা পরিলক্ষিত হয় মন্দির নির্মাণে। কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে বিজয়নগরের 'হাজারা মন্দির' ও 'বিঠ্‌ঠলস্বামী মন্দির'টি স্থাপত্য শিল্পের এক চরম নির্দশন। এই মন্দির দুটির অননুকরণীয় বৈচিত্র্য ও সৌষ্ঠব সমসাময়িক মধ্যযুগীয় শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিতে সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছিল। হাজারা রামমন্দির সম্পর্কে Longhurst মন্তব্য করেছেন, "One of the most perfect specimens of Hindu temple architecture in existence".

বিজয়নগরের স্থাপত্যরীতি ও শিল্পশৈলী তার মন্দির স্থাপত্যকে সর্বাধিক গৌরবময় করেছে। উক্ত শিল্পরীতির মাধ্যমেই হিন্দু শিল্পকলার ও সংস্কৃতির নবজন্ম ঘটেছে। বিজয়নগরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর অপূর্ব সমৃদ্ধ শালী সূক্ষ্ম ও জটিল অলংকরণ ও কারুকার্য। 'হাজার স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ'— মন্দির স্থাপত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য। বিজয়নগর তার অজস্র মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। 'মন্দিরনগর' হিসাবে পরিচিত পার্শ্ববর্তী বাহমনী রাজ্যের ইসলামীয় সংস্কৃতির পাশে শতাধিক বর্ষব্যাপী হিন্দু সংস্কৃতির ধবজা বহন করেছে।

হিন্দু-ধর্মীয় রীতিনীতির প্রাধান্যে বিশ্বাসী বিজয়নগর-এর নরপতিরা অপরাপর ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিও সহনশীল নীতি প্রদর্শন করেছিলেন। সব বিদেশী পর্যটকই উক্ত সত্যটি স্বীকার করেছিলেন। এখানে সব ধর্মের মানুষই বসবাস করতেন। সব ধর্মের উপাসনা সমগ্র বিজয়নগর সাম্রাজ্য বিনা-বাধায় প্রচলিত ছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য হিন্দু সাম্রাজ্য বলে বিবেচিত হলেও, মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণা থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন। রাজা দেবরায় দু'হাজার মুসলিমকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। এছাড়া দেবরায়ের সেনাবাহিনীতে দশ হাজার মুসলিম সেনাও ছিল। সংস্কৃতির দিক থেকে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বিজয়নগরের শাসকদের এটা কম গৌরবের বিষয় নয়। এবিষয়ে বিদেশী পর্যটক বারবোসার মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছিলেন— হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী বিজয়নগরের শাসকদের পরধর্মসহিষ্ণুতা সুসংস্কৃত ও আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানী রাজত্বে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে হিন্দু সংস্কৃতির উজ্জ্বল ধারার অবসান নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের অবকাশ আছে, তবে পরবর্তী মারাঠা সাম্রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বিজয়নগর সৃষ্ট গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মনীষীর মনীষায় বিজয়নগর সাম্রাজ্য

বিজয়নগরে শৌর্যশালী নবীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

দক্ষিণ ভারতে প্রথম বৈদেশিক বিশেষত অহিন্দুদের ব্যাপক অভিযান হলো তা ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন কর্তৃক দেবগিরি আক্রমণ। এরই পিঠে পিঠে তিন চারটি বিশাল সামরিক অভিযান ১৩১৮ খৃঃ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর ও খুসরু খানের নেতৃত্বে। এরা বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হাজার হাজার হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন। এই পঁচিশ বছরে মুসলমানরা কার্যত সারা দক্ষিণ ভারত দখল করে এবং দেবগিরি থেকে মালাবার পর্যন্ত পাঁচ ছয়টি প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত ও শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব মুছে ফেলে।

এই ইতিহাস হিন্দুজাতির মর্যাদা ও আত্মসম্মানের পক্ষে যতই লজ্জাকর হোক না কেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দু পরাক্রম তাঁদের পুর্বপুরুষ অগস্ত্য মুনির মত ম্লেচ্ছ শত্রুর অদম্য প্রলয়ঙ্কর তুফানে ভরা সেই সেনা-সাগরকে এক গণ্ডুষে পান করে ফেললেন, এবং প্রায় এক দশকের মধ্যে দিল্লীর সুলতানী প্রভুত্বের ধবজা উপড়ে ফেলে দিয়ে দক্ষিণ ভারতে এক পরাক্রমশালী হিন্দুরাষ্ট্র 'বিজয়নগরের' প্রতিষ্ঠা করলেন। এই সাফল্য তাঁরা যে বিদ্যুৎবেগে অর্জন করেছিলেন, তা হিন্দু জাতির পক্ষে অশেষ গৌরবজনক এবং আমরা এই কারণে তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও গর্বিত।

প্রাচীন যাদব কুলের সঙ্গম নামক এক ব্যক্তির দুই পুত্র হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা প্রথমে আনাগোণ্ডীর রাজদরবারে চাকরি করতেন। আলাউদ্দিন কর্তৃক দেবগিরি ও বরঙ্গল অভিযানের সময় আনাগোণ্ডী রাজ্যও মুসলিম কবলিত হয়েছিল। আনাগোণ্ডী অথবা তার কাছাকাছি কোনও স্থানে রামায়ণের বালির রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা অবস্থিত ছিল। আনাগোণ্ডীর পতনের পর হরিহর ও বুক্ক ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে বন্দী রূপে দিল্লীতে আনীত হন এবং তাদের বলপূর্বক মুসলমান করা হয়। পরে তাঁদের ব্যবহার এবং যোগ্যতায় প্রীত হয়ে সুলতান তাঁদের উভয়কে একদল সেনার নেতৃত্ব দিয়ে ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু যখনই তাঁরা দাক্ষিণাত্যে এলেন—

সম্ভবত পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীঃ দক্ষিণ ভারতে এসেই তাঁরা শঙ্কেশ্বর মঠের তৎকালীন প্রধান শ্রীশঙ্করাচার্য বিদ্যারণ্য স্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন। ইনি রাজনীতিতেও পারদর্শী ছিলেন। অবিলম্বে তিনি দুই ভাই-এর দ্বারা হিন্দু বাহিনী গঠন করে, যে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব নিয়ে এসেছিলেন, তাদের পরাভূত করলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য বিদ্যারণ্য স্বামী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁরা তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করলেন। রাজধানী স্থাপিত হল তুঙ্গভদ্রার তীরে এক নূতন নগর নির্মাণ করে। তার নামকরণ হল 'বিজয়নগর'। ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্যের ভার দেওয়া হলো, শ্রীহরিহরের হাতে। শ্রীবিদ্যারণ্য প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

এটা খুবই সম্ভব যে, তাঁরা উভয়ে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছাবার বহু আগেই গোপনে তাঁদের অভিপ্রায়ের কথা অন্যান্য হিন্দু রাজাদের এবং বিদ্যারণ্য স্বামীর কাছে জানিয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পৌঁছেই তাঁরা মহম্মদ তুঘলককে কলা দেখিয়ে প্রকাশ্যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেন। হিন্দু সম্রাট নাসিরুদ্দিনের সফল সামরিক বিপ্লব ইতিমধ্যেই দাক্ষিণাত্যের রাজপরিবারসমূহ এবং বিদ্যারণ্য স্বামীকে উৎসাহিত করেছিল। স্বভাবতই হরিহর ও বুক্ক যখন হিন্দুধর্মে ফিরে আসতে আগ্রহী হলেন, তখন বিদ্যারণ্য স্বামী ও হিন্দু রাজপরিবারগণ কর্তৃক তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়া সহজসাধ্য হয়েছিল।

দিল্লীতে শ্রীধর্মরক্ষক (নাসিরুদ্দিন) যে রাজনৈতিক বিপ্লব এনেছিলেন, তার ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা, এই মহান ঘটনাকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসকার-রা অতি ক্ষুব্ধ ও অপমানজনক ভাষায় উল্লেখ করে থাকেন। এর থেকেই বোঝা যায়, বর্তমানের ইতিহাসের বইগুলিতে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীর কতখানি অভাব রয়েছে।

হিন্দু পরাক্রমের সহায়তায় নূতন বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হিন্দু ইতিহাসে যতটা গৌরবমণ্ডিত করে লিখিত হওয়া উচিত ছিল, তেমনটা হয় নাই।

বিজয়নগর হিন্দু রাজ্যের বৈভব

বিদেশী পরিব্রাজকরা বিজয়নগরের নাগরিক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথাই উল্লেখ করেছেন; তা নয়, ওই সময়কার রাজবৈভব, পরাক্রমী প্রভাব খুবই উৎসাহ সহকারে উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ পর্তুগীজ ভ্রমণকারী দুয়ার্তে বার্বোস সেখানে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। তিনি নিজের চোখে ওই রাজ্যের অতুলনীয় বৈভব দেখে পরম বিস্ময় প্রকাশ করে গেছেন।

পারস্যের রাজদরবারের দূত পরিষ্কার লিখেছেন, 'সারা দুনিয়ায় এই শহরটির মতো সুন্দর শহর আর পাওয়া যাবে না।' রাজপ্রাসাদের সান্নিধ্যে বিশাল বাজার— সেখানে মণি-মুক্তা এবং নানান অলঙ্কার পাওয়া যেত। বিদেশী ভ্রমণকারীরা লিখেছেন, রাজপথে হাজার হাজার নাগরিককে সোনা ও মণি মুক্তার গহনা পরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। পর্তুগীজ ভ্রমণকারী পিয়েস লিখেছেন, 'বিজয়নগর রোম নগরীর মত বিশাল ছিল।'

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেবরায়ের রাজত্বকালের আগেও বিজয়নগরের হিন্দু সাম্রাজ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অশেষ শক্তিশালী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। বাহমনী রাজ্যের পাঁচটি অংশ নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হওয়ায় বিজয়নগর সাম্রজ্যের খুবই সুবিধা হয়েছিল। তৎকালীন হিন্দু রাজনীতিবিদরা বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা বিস্তারে এবং মুসলমানদের শিক্ষা দিবার জন্য এই কলহের সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বিজয়নগরের রায়দের সাহায্য ও সম্মতি ব্যতীত মুসলমান সুলতানেরা স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারতেন না। মুসলমানদের প্রত্যেকটি চক্র বিজয়নগরের হিন্দু শাসকদের সমর্থন সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতো। হিন্দু রাজাদের মুসলমান সেনা প্রতিপালন করার যে বাস্তব জ্ঞান বর্জিত উদারতা দুর্বল ও অকর্মণ্য রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের সময় দেখা গিয়েছিল, তা এই সময়ে পরিত্যক্ত হয়েছিল। যে সব হিন্দু রাজা নিজ রাজ্যের রাজধানীতে মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরি করতেন, তারা নিজেদের ধর্মীয় সহনশীলতা দেখিয়ে মুসলমানদের হাতে আনার জন্য চেষ্টা করতেন। কিন্তু ভীরুতার দ্যোতক সেই ধর্মীয় সহনশীলতার যুগের অবসান হয়েছিল এবং মুসলমান রাজ্যগুলির উপর আক্রমণ ও মসজিদ প্রভৃতি ধ্বংস করে প্রতিশোধাত্মক যুগ শুরু হয়েছিল। হিন্দুরা এখন উদারতা সহনশীলতা প্রভৃতি বিকৃত চিন্তাধারা ত্যাগ করে কঠোরতা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের প্রকৃত পথের অনুসরণ শুরু করেছিলেন।

বিজয়নগর রাজ্য ছিল হিন্দুত্বের পীঠস্থান

ডঃ নিখিলেশ গুহ

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্ত্রণালয়।

ভারত ইতিহাসের পর্ব বিভাজন করতে গিয়ে এককালে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এদেশের অতীত ও মধ্যযুগকে যথাক্রমে "হিন্দু" ও "মুসলমান" নামে অভিহিত করেন। তা যে কতবড় ভুল বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস তার প্রমাণ। সত্য বটে যে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী সুলতানী প্রতিষ্ঠিত হবার পর একে একে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চ ল মুসলিম শাসনের অধীনস্থ হয়। দাক্ষিণাত্যের চতুর্দশ শতকের শুরুতে আলা-উদ্দিন-খিলজীর রাজত্বকালে ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি প্রসারিত হয়। কিন্তু হিন্দু ধর্মের একটি আশ্চ র্য ক্ষমতা দেখা গেছে বিপর্যয়ের মুখে বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর। বিজয়নগর রাজ্যের ইতিহাস সে কথাই প্রমাণ করে। দক্ষিণের মুসলমান রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে প্রায় তিনশো বছর তা নিজের স্বাতন্ত্র্য তথা হিন্দুধর্মের জয়ধবজা সগর্বে তুলে ধরেছিল।

বিজয়নগর রাজ্য কবে থেকে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত হতে পারেননি। কিন্তু এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দক্ষিণের পূর্বতন হিন্দু রাজ্যগুলি যখন মুসলিম আগ্রাসনের সামনে নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ, মুসলমান শাসনের অধীনে হিন্দু সমাজ যখন জর্জর, তখন এক বিরুদ্ধ শক্তির প্রতিক্রিয়ায় বিজয়নগর রাষ্ট্রের জন্ম। কথিত আছে, তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণে হরিহর এবং বুক্ক নামে দুই ভাই চতুর্দশ শতকের শেষে মুনিবর মাধব বিদ্যারণ্য এবং বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকার সায়নাচার্যের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি। প্রথম হরিহরের পুত্র দ্বিতীয় হরিহরের একটি শিলালিপিতে মাধব বিদ্যারণ্যের সশ্রদ্ধ উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৪০৬ সালে দ্বিতীয় হরিহর মারা যান। তাঁর রাজত্বকালে প্রতিবেশী বাহমানী রাজ্যের সঙ্গে বিজয়নগরের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে র শুরু হয়। কৃষ্ণা এবং তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চ লের ওপর অধিকার লাভ ছিল এই যুদ্ধে র মূল কারণ। ভাগ্যলক্ষ্মী কখনও এ-পক্ষ কখনও ও-পক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন শিলালিপি বিচার করলে প্রমাণ হয়, দ্বিতীয় হরিহরের রাজ্য মহীশূর অতিক্রম ক'রে দক্ষিণে ত্রিচিনপল্লী এবং কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ছিলেন ভগবান শিবের উপাসক যদিও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাজত্বকালে গোয়া বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধি তে আকৃষ্ট হয়ে পঞ্চ দশ শতকে দুজন বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক এখানে আসেন। এঁদের বিবরণ থেকে আমরা সে-সময়ের অনেক কথা জানতে পারি। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকোলো কোণ্ডি নামে একজন ইতালীয় পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি বিজয়নগর শহরের পরিধি ছিল প্রায় ষাট মাইল বিস্তৃত। অস্ত্রধারণে সক্ষম প্রায় নববই হাজার লোক এই শহরে বাস করত। বিজয়নগরের রাজা ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী নৃপতি বলে নিকোলো কোণ্ডি জানিয়েছেন। ১৪৪২-৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পারসিক রাজদূত আবদুর রজ্জক বিজয়নগর রাজ্যে অবস্থান করেন। তিনি এই রাজ্য বিপুল জন-অধ্যুষিত বলে বর্ণনা করেছেন। নিকোলো কোণ্ডির মতো তিনিও বলেছেন—বিজয়নগরের রাজা এদেশে সবচেয়ে পরাক্রান্ত। রাজধানী বিজয়নগর শহরটি ছিল সাতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এরূপ সমৃদ্ধ শহর পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না বলে আবদুর রজ্জক মন্তব্য করেছেন। বিজয়নগর রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি র চিত্র তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে। রাজ্যে তিনশোটি বৃহৎ বন্দর ছিল। রাজভাণ্ডারে গর্ত খুঁড়ে গলানো সোনা জমানো হোত। সকল শ্রেণীর অধিবাসীরা গলায়-কানে-হাতে-আঙুলে মণিমুক্তো এবং স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করতেন। গোয়া এবং অন্যান্য বন্দর পথে ইউরোপ এবং এশিয়ার সম্পদ বিজয়নগর রাজ্যে প্রবেশ করত।

বিজয়নগর রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-২৯)। তাঁর আমলে রাজ্যের সবচেয়ে বিস্তৃতি ঘটে। পশ্চি মে দক্ষিণ কোঙ্কন, পূর্বে বিশাখাপত্তনম এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত তাঁর অধিকার প্রসারিত ছিল। ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও সম্ভবত তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে। বিজয়নগর রাজ্য ধ্বংস করে তিনি গুলবর্গা দুর্গ ধ্বংস করেন। তাঁর উড়িষ্যা অভিযানও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। গোয়ার শাসনকর্তা আলবুকার্ককে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন। পর্তুগীজ পর্যটক পাত্রস এই সময়ে বিজয়নগর রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রাজা তাঁর মতে বিদেশীদের বিশেষ আপ্যায়ন করতেন এবং সর্বাধিক উপায়ে তাঁদের সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে সত্তর লক্ষ পদাতিক, ৩২,৬০০ অশ্বারোহী এবং ৬৫১ হস্তি ছিল। পর্তুগীজরা তাঁকে ঘোড়া যোগাত। তৎকালীন ভারতের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজা হিসাবে কৃষ্ণদেব রায়কে বর্ণনা করলেও শৃঙ্খলা এবং রণকৌশলে মুসলমান বাহিনীগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল বলে পাত্রস মন্তব্য করেছেন।

কৃষ্ণদেব রায়ের কৃতিত্ব কেবলমাত্র শক্তিশালী রাজ্য সংগঠনে সীমিত ছিল না। পাত্রস-এর বর্ণনানুযায়ী, তিনি ছিলেন প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী, সুশিক্ষিত। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হলেও তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ। তাঁর সভায় গুণীর সমাদর ছিল। "অষ্ট দিগগজ" নামে আটজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তাঁর সভা অলঙ্কৃত করতেন। কৃষ্ণদেব রায় রচিত "অযুতমাল্যদ" গ্রন্থ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তিনি সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হয়। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণের পরিবর্তে "প্রবন্ধ" নামে পরিচিত স্বাধীন রচনা রীতির প্রবর্তন হয়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও রাজকার্যে তিনি কোনরূপ ধর্মীয় সংকীর্ণতার আশ্রয় গ্রহণ করেননি। বিজয়নগর রাজ্যে পাত্রস নানা দেশের বিভিন্ন জাতির মানুষের সহাবস্থান লক্ষ্য করেছেন; বাণিজ্যিক কারণে এরা আকৃষ্ট হোত। এডোয়াডো বারবোসা নামে অপর একজন পর্যটক ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরে এসেছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশংসা করে তিনি বলেছেন,—রাজা খৃষ্টান, ইহুদী, মুর (অর্থাৎ মুসলমান) বা হিন্দু নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে আসা-যাওয়ার এবং নিজ ধর্মাচরণ ও বসবাসের স্বাধীনতা দান করেছেন।

বিজয়নগরের আর্থিক সমৃদ্ধি র চিত্র পাত্রস ও বারবোসের লেখায় পাওয়া যায়। পাত্রস-এর দৃষ্টিতে বিজয়নগর ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ শহর। চাল, গম, ভুট্টা, যব, বিভিন্ন ধরণের ডাল এবং অন্যান্য শস্যবীজ তথা ঘোড়ার খাবার এখানে প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকত। পথেঘাটে বাজারে অসংখ্য ভারবাহী বলদ দেখা যেত। একইভাবে বারবোসা বলেছেন বিজয়নগর ছিল জনাকীর্ণ বিশাল একটি শহর। চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম, পেগু (অর্থাৎ ব্রহ্মের) চুনি, দেশীয় হীরা এবং মালাবার অঞ্চ লের কর্পুর, কস্তুরী, সিদুঁর, গোলমরিচ ও চন্দন বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে তা খ্যাতি অর্জন করে।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংস সূচিত হয়। বিজয়ী মুসলমান সৈন্য বাহিনী সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর শহর ধ্বংস করে। বৃদ্ধ রাজা রাম রায় যুদ্ধ শেষে শত্রুহস্তে নিহত হন। বিজয়নগর রাজ্য আরও একশো বছর কোনও মতে অস্তিত্ব নির্বাহ করে ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়। আজকের পর্যটক ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে বিলুপ্ত এক জনপদের কল্পনা করতে পারেন মাত্র। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে বিঠ্ঠলস্বামী মন্দির কিম্বা কৃষ্ণদেব রায় নির্মিত হাজারা মন্দির। হিন্দু মন্দির নির্মাণ শৈলীর চরম উৎকর্ষ বিজয়নগর যুগের স্থাপত্য কর্মে লক্ষ্য করা যায়।

কৃষ্ণদেব রায় সঙ্গীতের পারদর্শী ছিলেন। দক্ষিণী সঙ্গীতের বিবর্তনেও বিজয়নগর রাজ্যের অবদান কখনও বিস্মৃত হবার নয়।

সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বিজয়নগর সাম্রাজ্য

তুঙ্গভদ্রার তীরে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পান্থলিপি হইতে সংগৃহীত। ত্রন্দ্বভ্রন্দ্বপুপ্ত-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনাকাল খৃঃ ১৪৩০-এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃঃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্ত ধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, সুলতান ইল্‌তুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবর শাহ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙ্গালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবর শাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন,

হাম্পিস্থিত মন্দিরে নৃসিংহ প্রতিমা।

অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রজ্জু এবং ২ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical Fiction."

ঊর্মিমর্মর

দক্ষিণ ভারতে বাক্য প্রচলিত আছে: গঙ্গ ার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান। অর্থাৎ গঙ্গ ার জলে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তুঙ্গার জল পান করিলেও সেই পুণ্য। তুঙ্গার জল পীযূষতুল্য, মৃত-সঞ্জীবন।

সহ্যাদ্রির সদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গা ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদী স্বভাবতই তুঙ্গা বা ভদ্রা অপেক্ষা পুষ্টসলিলা, কিন্তু তাহার পুণ্যতোয়া খ্যাতি নাই। তুঙ্গভদ্রা অনাদৃতা নদী।

তুঙ্গভদ্রার যাত্রাপথ কিন্তু অল্প নয়। ভারতের পশ্চি ম সীমান্তে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সে ভারতের পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইতে চায়। পথ জটিল ও শিলা-সঙ্কুল, সঙ্গিসাথী নাই। কদাচিৎ দুই-একটি ক্ষীণা তটিনী আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। তুঙ্গভদ্রা তরঙ্গের মঞ্জীর বাজাইয়া দুর্গম পথে একাকিনী চলিয়াছে।

অর্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিবার পর তুঙ্গভদ্রার সঙ্গিনী মিলিল। শুধু সঙ্গিনী নয়, ভগিনী। কৃষ্ণা নদীও সহ্যাদ্রির কন্যা, কিন্তু তাদের জন্মস্থান তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উত্তরে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল; পথে দেখা। দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল।

তুঙ্গভদ্রার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তাহার তীরে তীর্থ-সিদ্ধাশ্রম মঠ-মন্দির রচিত হয় নাই, তাহার তীরে মহানগরীর তুঙ্গ সৌধচূড়া দর্পণিত হয় নাই। কেবল একবার, মাত্র দুই শত বৎসরের জন্য তুঙ্গভদ্রার সৌভাগ্যের দিন আসিয়াছিল। তাহার দক্ষিণ তীরে বিরূপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গ-নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর। কালক্রমে এই বিজয়নগর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র ছয় শতাব্দীর কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিজয়নগরের গৌরবময় স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে বিজয়নগরের বহুবিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে কী বিচিত্র ঐতিহ্য সমাহিত আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল তুঙ্গভদ্রা ভোলে নাই।

কোনো এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়, আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো, শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে; নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের গল্প বলিতেছে। কত নাম—হরিহর, বুক্ক, কুমার কম্পন, দেবরায় মল্লিকার্জুন—তোমার কানে আসিবে। কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম-বিদ্বেষ, কৌতুক কৌতূহল, জন্ম-মৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।

তুঙ্গভদ্রার এই ঊর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে এক গণ্ডুষ তুলিয়া লইয়া পান করিব।

‘ইয়ে অন্দর কী বাত’

গত ৩০শে নভেম্বর, ০৯ ভারতীয় জনতা পার্টির ডাকা বাংলা বনধের সফলতায়, বাংলার ‘মা মাটি, মানুষ’ এর নেত্রী হতচকিত হয়ে বললেন— সিপি এমের নির্দেশে বনধ্ ডেকেছে বিজেপি। মন্তব্যটি অসত্য এবং কল্পনাপ্রসূত। নববই এর দশকের শেষ দিকে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতাসীন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ‘সিপি এমের দালাল’ অভিযোগ তুলে নেত্রী কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়লেন এবং বিজেপির সঙ্গে জোট গড়লেন। ভোট হল, সাফল্য পেলেন, মন্ত্রী হলেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস সিপিএমের ‘বি’টিম। প্রায় তিন বছর পরে ২০০১ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে জোট গড়লেন রাজ্যের কংগ্রেসের সাথে, যারা কিনা সিপিএমের ‘বি’টিম। তিনি রাজ্যের মানুষকে ‘উল্টে দিন, পাল্টে দিন’-এর ডাক দিলেন। ফলাফল বের হতে দেখা গেল কংগ্রেসী তরমুজ নেতারা সিপিএমের বদলে তাঁকেই উল্টে দিলেন। ব্যাস্, নেত্রী পাল্টে নিলেন নিজের অবস্থান, ফিরলেন বিজেপির জোটে। আবার বাজালেন সেই পুরানো ‘বি’-টিমের রেকর্ড। তারপরে নেত্রীর দলের খারাপ অবস্থা হল। পঞ্চায়েত ভোটের পর হতে নেত্রীর কপাল খুলল। তিনি আবার জোট বাঁধলেন কংগ্রেসের সঙ্গে। লোকসভা ভোট হল, তিনি দারুণ সফলতা পেলেন। কিন্তু সিপিএমের ‘বি’-টিম মার্কা রেকর্ড আবার বাজালেন রাজ্য বিজেপির বিরুদ্ধে। অথচ ওনার জোট সঙ্গি কিছু কংগ্রেসী নেতা মঙ্গলকোট, উলুবেড়িয়া পৌরসভা, শিলিগুড়ি পৌরসভার ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে সিপিএম তথা বামফ্রন্টের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলেন। কিন্তু নেত্রী তার বিরোধিতা না করে প্রকাশ্যে জনগণের কাছে ক্ষমা চাইছেন। ব্যাপারটি কেমন সন্দেহজনক নয় কি? দুর্জনেরা বলছেন ‘ইয়ে অন্দর কি বাত হ্যায়’।

পরিশেষে একটা কথা বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গে বামফন্ট বিরোধিতা করার জন্য নেত্রী কোনও পেটেন্ট করিয়েছেন নিশ্চয়ই, যার ফলে তিনি যখন যার সাথে জোট করবেন সে হবে বামফ্রন্ট বিরোধী আর বাকিরা হবে সিপিএমের দোসর।

অরুণাভ সেন, বাগনান, হাওড়া

কমনওয়েলথ-এর চক্রব্যূহ

১৬ই নভেম্বর ২০০৯ তারিখে তরুণ বিজয় মহাশয়ের ভারতের কমনওয়েলথের সদস্য থাকা উচিত? লেখার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট মধ্যরাত্রিতে কিছু রাজনৈতিক চোর দেশটাকে তিন টুকরো করে স্বাধীনতা নামক “মাকাল” ফলটি হাতে পেয়ে খুশিতে ডগমগ হয়েছিল।

চুক্তিলব্ধ স্বাধীনতার এই ফল ছাড়া জাতির ভাগ্যে আর কি হতে পারে।

স্বাধীনদেশের রাষ্ট্রপতির ইংল্যাণ্ডের রাণীর হাত থেকে ব্যাটন নিতে লজ্জাবোধ হয়নি। তৎকালীন কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে বৃটিশের গোপন চুক্তি হয় ভারত কে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু ভারতে কে “কমনওয়েলথ’ এর সদস্য থাকতে হবে। নেতারা ক্ষমতা দখলের লোভে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করে সেই চুক্তিতে সই করে স্বাধীনতা নামক ‘মাকাল ফল’টি হাতে নিয়েছিলেন। চুক্তিতে কি ছিল আজও ভারতবাসী জানতে পারেনি। এ বিষয়ে জানতে হলে মিঃ লিওনার্ড মোসলের লেখা “Last days of British Raj” বইখানি পড়তে হবে। মিঃ লিওনার্ড মোস্‌লে এক জায়গায় লিখেছেন “Official documents dealing with the transfer of Power in India will not be officially released untill 1999.”

কিসের কারণে কেন এধরনের চুক্তি? কার স্বার্থের কথা চিন্তা করে এই চুক্তিতে তৎকালীন কংগ্রেসী নেতারা সই করেছিলেন? বর্তমানে ২০০৯ চলছে আজও কেন এই চুক্তি জনগণের সম্মুখে আনা হয়নি? লোকমুখে এনেছি পরবর্তীতে এই চুক্তিটির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

যেহেতু ভারত এখনও কমনওয়েলথ এর সদস্য আছে সেই হেতু কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না, “জাতির কলঙ্ক”।

ভারত এখনও ওই সদস্য পদে আছেন সদস্য বাতিল করার আন্তরিক প্রচেষ্টা কোন রাজনৈতিক নেতাদের নেই।

ভারত-এর সংবিধান-এর ৩২৭ নং ধারায় বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন প্রজাতন্ত্র হওয়ার পরেও ভারত এর ওপর প্রযোজ্য রাখার বিধান রয়েছে। ভারতে ওই আইন চালু আছে।

১৯৪৯ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে-এ ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভারত এক সভ্‌রেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপাবলিক-এর রূপ পরিগ্রহ করছে, অথচ বৃটিশ কমনওয়েলথ এর পূর্ণ সদস্য থাকবে, এ এক ঐতিহাসিক চুক্তি। এইবছরই বৃটিশ পার্লামেন্টে এক অ্যাক্ট পাশ করে। এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫০ সাল এর ২৬শে জানুয়ারি রিপাবলিক গঠন করার পরও বৃটিশ আইনে ভারত এর মর্যাদা, অধিকার, সুযোগ-সুবিধা রিপাবলিক গঠন করার আগে যাচ্ছিল, সেই রকমই থাকবে। ভারত যতদিন না কমনওয়েলথ এর সদস্য পদ বাতিল করবে ততদিন এই ভাবেই “রাণীর হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে খেলার মাঠে যেতে হবে, এবং বিদেশে ভারতীয়দের অপমান সহ্য করতে হবে।

অনিল চন্দ্র দেবশর্মা, নতুন পাড়া, কোচবিহার

কন্দহার-কাণ্ডের অপেক্ষা?

কোন আসামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বা তার ক্ষমার আর্জির নিষ্পত্তিতে অসম্ভব দেরী হলে আসামী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়ার অধিকারী। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের গত ২৪শে সেপ্টেম্বরের এই মন্তব্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে মহামান্য আদালত নাকি আরও বলেছেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের মৃত্যুদণ্ড মকুবের আর্জির দ্রুত নিষ্পত্তি করা কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক কর্তব্য। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ না নিয়ে সরকার শুধু আসামীর প্রতি অবিচারই নয় তার মুক্তির মৌলিক অধিকারও হরণ করছে।

মহামান্য আদালতের মন্তব্য স্বাগত যোগ্য। উপরের মন্তব্যে স্পষ্ট আদালতও অভিযুক্তদের চটজলদি শাস্তি চায়। উপরিউক্ত মন্তব্য কি মহামান্য আদালতের বিরক্তিই বহিপ্রকাশ নয়।

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামীদের অকারণে জেলে রাখা শুধু সাজাপ্রাপ্ত আসামীর প্রতিই নির্দয় অবিচার নয় বরং যে অপরাধের জন্য আসামী সাজা পেয়েছে তার ভুক্তভোগীদের প্রতিও ঘৃণ্য অবিচার। সংসদ তবিয়তে রেখে বর্তমান ইউ পি এ সরকার কি হুতাত্মা বীর সুরক্ষাকর্মী ও তাদের পরিবার বর্গের প্রতি অবিচার করছেনা? শুধু তাদের পরিবার বর্গই কেন দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থানে হানা চালিয়ে যারা আমাদের দেশকে গভীর সংকটের মুখে ফেলতে চেয়েছিল তাদের দিনের পরদিন জামাই আদরে রেখে ইউপিএ সরকার কি ১১০ কোটি ভারতীয়দের কাটা ঘায়ে নুন ছড়াচ্ছে না? কাল যদি সন্ত্রাসীরা আরও এক কন্দহার-কাণ্ড ঘটিয়ে অভিযুক্তদের মুক্তির দাবি করে তবে বর্তমান রাষ্ট্রনেতারা নির্লজ্জভাবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না তার গ্যারান্টি কই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ইউপিএ জোটের সাথে সাথে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ এন ডি এ জোটও নিজ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। তারা ভোটের আগে যে ভাবে এ বিষয়ে সোচ্চার ছিল ভোটের পর হঠাৎ একদম চুপ! কারণ অজানা। আর এ বিষয়ে সবজান্তা বামেদের প্রসঙ্গ টেনে পাঠকদের বিব্রত করতে চাই না। সুতরাং ১১০ কোটি ভারতবাসীদের এই বলেই সান্ত্বনা পেতে হবে— “পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে”।

প্রণয় রায়, হরেকৃষ্ণ বোস লেন, কোলকাতা-৫০

এক ব্যর্থ প্রহসন

পশ্চিমবঙ্গে নানা রাজনৈতিক দলের যুযুধানতায় নরহত্যার নারকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। তার প্রশমনে পারস্পরিক দোষারোপ ভিন্ন কোনও সমবেত প্রয়াস দেখা যায়নি। তৃণমূলের বিশেষ চাপে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার পঞ্চ প্রতিনিধি প্রেরণ করেন কারণ অনুসন্ধান এবং প্রশমনের উপায় নির্ধারণের জন্য। জনগণের বহুলক্ষ টাকা অপচয় করে তাঁরা এলেন, ভোজসভায় আলোচনান্তে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলেন। ওই নরমেধ যজ্ঞের স্থানগুলিতে গেলেন না। জেলাশাসক এবং আরক্ষাধ্যক্ষ ও স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট। নিপীড়িত জনগণের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনও বোধ করলেন না। তৃণমূল নেতৃত্বের উচিৎ এই উপেক্ষা এবং অপমানের জন্য তাঁদের সরকার হতে পদত্যাগ করা। এইখানে উন্মত্ত আন্দোলন এবং ওইখানে নীরবতা ও ব্যর্থতার জন্য তাঁদের কার্যকারিতা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হল। কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপির জুজুর ভয়ে জনকল্যাণে তাঁদেরই একটি অংশের বিদ্রোহে সহিষ্ণু। জনরক্ষায় এবং জনকল্যাণে এঁরা কেউই আগ্রহী নন্ প্রমাণিত হল। ভুলে গেছেন ঋষি কবির মধ্যে—‘সত্য যে কঠিন, কাঠিনেরে ভালবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চ না। ইতি—

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, ঋষিধাম, দত্তপুকুর উঃ ২৪ পরগণা

পশুপ্রেমী

কুরবানি উপলক্ষে কোলকাতা সহ গোটা রাজ্যে গোরু, ছাগল, উট প্রভৃতির বিক্রির জন্য প্রায় মেলার আয়োজন হয়। এ বিষয়ে রাজাবাজার-খালপাড়, দ্বিতীয় হুগলী সেতুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চ ল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরবানির দিন মুসলিমদের হাতে হত্যা হবে এই অবলা পশুগুলির। কিন্তু কোরাণে বলা আছে নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তুকে আল্লার উদ্দেশ্যে দান করতে। অর্থাৎ, পিতা তার সন্তানকে, প্রেমিক তার প্রেমিকাকে আল্লার উদ্দেশ্যে কুরবানি দেবে। অর্থাৎ কুরবানির নামে যথেচ্ছ পশুহত্যার কথা কোথাও উল্লেখ নেই। অর্থাৎ এত সংখ্যক পশু নিধন সত্ত্বেও তথাকথিত পশুপ্রেমীরা আশ্চর্যজনক ভাবে নীরব। তারা দুর্গাপূজা ও কালীপূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, কিন্তু কুরবানির সময় কোথায় যে গা ঢাকা দেন তা বোঝা দায়। এঁরা পূজার সময়ে যে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, সেগুলিকে বাঁচানোর জন্য যে রকম প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তা স্বজাতি প্রেমকেই মনে করায়। কিন্তু কুরবানির নামে গোহত্যা বন্ধের জন্য একটি শব্দও ব্যবহার করেন না। এঁদের কাছে পূজায় বলিদান হল নারকীয় উল্লাস কিন্তু কুরবানির দিন গোরুর জবাই এক অত্যন্ত পুণ্যকর্ম। সত্যি কি বিচিত্র এই পশুপ্রেমী সমাজ। এরা পাঁঠাকে স্বজাতি ভাবতে প্রস্তুত, কিন্তু গোরুকে মাতা নয়।

রাজু হালদার, পোঃ-জামালপুর, জেলা-বর্ধমান

প্রসঙ্গ ঃ ৬ ডিসেম্বর

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও একটি ৬ ডিসেম্বর অতিক্রান্ত। যথারীতি শিবাকুল বিলাপ করতে, অশ্রু বিসর্জন করতে বিলম্ব করল না। কিন্তু কেন? ১৭ বছর আগে অযোধ্যায় একটি বিতর্কিত ধাঁচা, যেটি আসলে একটি হিন্দু মন্দির ছিল, সেটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল বলে এখনও রাজনৈতিক নেতা এবং বুদ্ধি জীবীদের এত অশ্রু বিসর্জন কেন? সব কিছু খতিয়ে দেখলে, মনে হয় না কি, এরা প্যান-ইসলামের এজেন্ট? আরব দেশগুলি থেকে পাঠানো পেট্রোডলারের অংশ এরা নিয়মিত পেয়ে থাকে? ১৯৮২ সালে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে জামাত-ই-ইসলামের এক সমাবেশে আরবের রিয়াধ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ডঃ আমেদ ভারতে হিন্দুদের মুসলিম করার বিষয়ে মার্কসবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির সাহায্য নিতে বলেন।

তিনি বলেন, এইসব দলের কোনও আদর্শ নেই। ভোট পাওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত লাভে আশায় এরা যে কোনও কাজ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, ভারতের সংবাদপত্র, সেকুলার সাম্যবাদী এবং জাতীয়তা-র ভেক্‌ধারী দলগুলিকে সৌদি আরব ২৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। এর ফলে খুব ভাল কাজ হয়েছে। হিন্দুদের সংগঠিত হতে দেবার বিরুদ্ধে এরা সবসময় সোচ্চার। ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ২০ থেকে ২৫ কোটি করতে পারলে এই সমস্ত দলগুলিকে শেষ করে দেওয়া হবে। ইরানের শাহ্‌কে হটাবার সময় আমরা খোদ রাশিয়া সহ ইরানের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য নিয়েছি, শাহ্‌কে তাড়াবার পরই কমিউনিস্টদের শেষ করে দিয়েছি, ইত্যাদি।

১৯৮২ সালে যদি আরব দেশগুলি থেকে ২৫০ কোটি টাকা এসে থাকে, তাহলে এখন এই ২০০৯ সালে কত কোটি পেট্রো-ডলার তা এসেছে অনুমান করা যেতে পারে। আর এই পেট্রো-ডলারের ভাগ পাচ্ছে দেশের বেশ কিছু বুদ্ধি জীবী, রাজনৈতিক নেতা। তাই এদের এত ব্যথা, বেদনা, অশ্রু বিসর্জন। ১৭ বছর আগের এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৬ ডিসেম্বর-এ প্রতিবাদ মিছিল, ধিক্কার দিবস প্রভৃতি উদ্‌যাপন করছে। বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা চেন্নাইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের বাসভবন অবরোধ করতে সচেষ্ট হয়। বিক্ষোভকারীরা মিছিল করে রাজভবনের দিকেও অভিযান করতে চেষ্টা করে। এতসব কালা দিবস, ধিক্কার দিবস, প্রতিবাদ মিছিল প্রভৃতি করে রাজনৈতিক দলগুলি নিমকের

দাম দিচ্ছে, না এরা নিমকহারামি করেন না। তাই এত চিৎকার, চেঁচামেচি, শোরগোল। অথচ অযোধ্যা ঘটনার পটভূমিতে কাশ্মীরে, পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে শত শত মঠ, মন্দির, আশ্রম ভাঙ্গা হলো। সে সব নিয়ে এইসব রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধি জীবীদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

অযোধ্যার বিতর্কিত ধাঁচা ভাঙ্গতে অন্তত ভারত সরকারের কোনও হাত ছিল না। অথচ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, চার প্রদেশের চার মুখ্যমন্ত্রী আর প্রবীণ সরকারি অফিসাররা দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা মাথায় বুলডোজার দিয়ে ভেঙে চুরমার করেছিলেন হিন্দু মন্দিরগুলি। লাহোরে মতিলাল নেহরুর স্মৃতি বিজড়িত কৃষ্ণ মন্দির সহ মোট ২৪৫টি হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা হয়েছিল পাকিস্তানে। ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ৩৬০০ হিন্দু মন্দির ভাঙ্গা হয়, ৪০,০০০ বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ৫০০০ হিন্দু নারী ধর্ষিতা হয়, ৯০০ হিন্দু যুবতী নিখোঁজ হয়। (বর্তমান- ২.৩.১৯৯৩)।

এসব কিছু জন্য সংসদে কোনও আলোচনা নেই, কোনও উত্তেজনা নেই, সবাই নির্বিকার। যেন এসব কোনও ব্যাপারই নয়। অথচ বাবরি মসজিদ ভাঙা হতেই যত হৈচৈ, যত উত্তেজনা, যত ধুন্ধুমার কাণ্ড। সবই পেট্রো-ডলারের মহিমা। এর আগে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় ঢাকার বিখ্যাত রমনা কালীমন্দির, আনন্দময়ী আশ্রম সব গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে গড়ে উঠেছে জাতীয় উদ্যান সোহরাওয়ার্দি পার্ক। এজন্য আমাদের দেশের রাজনীতিক, বুদ্ধি জীবী, সাংবাদিকদের নেই কোনও দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা। তাদের যত তর্জন গর্জন ওই বিতর্কিত কাঠামোর জন্য। আসলে সেটা ছিল একটা মন্দির। বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি যেটা ভেঙ্গে তারই ইঁট-পাথর দিয়ে তৈরি করেছিল মসজিদ। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ! বাড়িতে পোষা সারমেয়-রা যেমন প্রভুর নির্দেশে স্ব-জাতীয়দের আক্রমণ করে ছিন্নভিন্ন করতে দ্বিধা করে না, প্রয়োজনে প্রভুর জন্য জীবন দিতেও পিছপা হয় না, আমাদের দেশের রাজনৈতিক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধি জীবীদের প্রভুভক্তিও অনেকটা সেইরকম বলা যেতে পারে।

পরম্পরা

ভক্তাধীন ভগবান

ভক্ত বালকরাম

পুরুষোত্তম স্বামী

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
(গীতা ৯.৮.১৪)

জীবনের শুরু থেকেই মানব জীবনের উদ্দেশ্য অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল অল্পবয়সী বালকরামের জীবনে। বয়স পনেরো না পেরোতেই তাঁর মন অধ্যাত্মমুখী। পরিবারে পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কনিষ্ঠ তিনি। লবপুর বা লাহোরের (বর্তমানে পাকিস্তানে) স্বচ্ছল ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম তাঁর। ধর্মবোধ প্রবল। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে হাত-পা ধুয়ে জপধ্যান। তারপর নিত্যপূজা, শাস্ত্র অধ্যয়ন সবই নিয়মিত। ব্যতিক্রম কেবল সাংসারিক কাজে অবহেলা। খাওয়ার ও ঘুমানোর সময় ছাড়া তাঁর বাড়ীর সাথে কোনও সম্পর্ক থাকে না। বিরক্ত ভাইয়েরা, পিতা-মাতা সকলে। বয়স বাড়ার সাথে কোন পরিবর্তন নেই। বালকরামের খেয়ালী মন শত তিরস্কারে, উপদেশে, শারীরিক নিগ্রহেও শুধরোয় না। বরং বেড়ে চলে। শেষে নিরুপায় হয়ে বাড়ীর লোকজন তাঁকে তাড়িয়ে দেয় বাড়ী থেকে।

গৃহ বিতাড়িত বালকরাম পড়ে অকূল সাগরে। কোথায় পাবে খাদ্য আশ্রয়। অভিমানে শহর ছেড়ে চলে যায় জঙ্গলে। বনমধ্যে প্রবেশ করে ভাবেন, যাঁকে লাভ করলে অন্য লাভ অর্থহীন হয়ে যায়, সেই শ্রীহরিকে কেন দর্শনের চেষ্টা করব না। তাঁকে পেলে তো এই অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা কোনও স্পর্শ করতে পারবে না জীবনকে।

বালকরাম বসে গেলেন বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের নীচে। ধ্যানমগ্ন হলেন। বাহ্যজগত হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। অপসৃত ক্ষুধাতৃষ্ণা। কেটে যায় এক সপ্তাহ। শ্রীহরির ধ্যানে লীন বালকরাম।

আসন টলে ভগবানের। তবুও মনে হয় তাঁর বালকরামের ভক্তিকে একবার পরখ করে দেখা দরকার।

হঠাৎ কয়েকটা বাঘের সমবেত গর্জন কানে পৌঁছায় ধ্যানলীন বালকরামের। নিশ্চল, ভয়লেশহীন তিনি। ভাবেন রাখে হরি মারে কে। আমি তাঁরই ইচ্ছায় জীবিত। মৃত্যু যদি হয়, সেও তাঁর ইচ্ছা। অনর্থক আশঙ্কায় ডুবে লাভ কি? ভেবে তিনি আবার ধ্যানমগ্ন হলেন।

ভগবান বুঝলেন বালকরামের প্রেমের শক্তি। তাঁর প্রেম রজ্জুতে বাঁধা পড়লেন তিনি। বালকরামকে রক্ষা করতে শ্রীহরি ব্যাধের রূপ ধরে সেখানে এসে ধনুকে দিলেন টঙ্কার। বাঘেরা সেই শব্দে ভয়ে পালায় সেখান হতে। ধনুর টঙ্কারে বালকরাম চোখ মেললেন। ব্যাধ তাঁকে বললেন—ঠাকুর, এ বনে একা কেন বসে আছেন। জানেন না এখানে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের বাস। আপনার বিপদ হতে পারে।

বালকরাম হেসে জবাব দিলেন—পালাবো কোথায়? বাড়ী থেকে সবাই মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সেখানে ফেরার রাস্তা নেই। এখানে বসেই আমায় হৃদয়নাথ শ্রীহরির দর্শন করব। তা নাহলে বাঘের খাদ্য হতে আমার দুঃখ নেই।

ব্যাধ বললেন কৌতুকের ছলে—ঠাকুর, যাঁকে দেখার জন্য যোগী-ঋষিরা যুগ যুগ ধরে তপস্যা করে চলেছে, তুমি এত অল্প সময়ে কেমনে পাবে তাঁকে।

দেখো শবরভাই, আমি তাঁর নাম নিয়ে এখানে বসে আছি। তিনি ছাড়া এ জগতে আপন নেই কেউ। আমি তাঁকে না দেখে এ স্থান ত্যাগ করবো না। এই বলে আবার চোখ বন্ধ করলেন বালকরাম।

শ্রীহরি এবার দেখা দিলেন বালকরামকে। তুষ্ট তিনি বালকরামের তীব্র ভক্তি ও শরণাগতিতে। ইষ্টদেবের চতুর্ভুজ মূর্তি দর্শনে আনন্দ বিভোর। উন্মাদের মতো কখনও করজোড়ে স্তুতি করছেন। কখনও কীর্তন করছেন। আবার কখনও বা নৃত্য করছেন।

ভগবান শ্রীহরি বালকরামের শির স্পর্শ করে বললেন—বালক, তুমি বর প্রার্থনা কর। কিন্তু বালকরাম চাইবে কি। কিছু পাওয়ার জন্য তো তিনি শ্রীহরিকে ডাকেননি। তবুও বর চাইতে হল শ্রীহরির আজ্ঞায়। চাইলেন—এক, এটা তাঁর যেন শেষ জন্ম হয়। দুই, জন্মমৃত্যু তাঁর ইচ্ছাধীন হয়। তিন, মৃত্যুর পর তাঁর যেন বৈকুণ্ঠলাভ হয়। শেষে বললেন—আমার স্পর্শে পাথর যেন সোনা হয়ে যায়। শ্রীহরি 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন।

শ্রীহরি দর্শনে বালকরামের জীবন কেবল স্বর্ণময় হল না, তাঁর স্পর্শে পাথর সহ যে কোন ধাতু সোনায় পরিণত হতে লাগল। সেই সোনা বিক্রি করে প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী হলেন তিনি। তৈরি করলেন বিশাল মঠকেন্দ্র। বহু ভক্ত, বিদ্যার্থী, আর্তজনের আবাস হয়ে উঠল সাধু বালকরামের মঠভবন।

প্রভূত বিষয়-আশয়, সম্পদের প্রাচুর্য, আড়ম্বরের মধ্যে থেকেও বালকরাম থাকেন নিরাসক্ত। বিষয় থেকে মুক্ত হতে একদিন তিনি কৌপীন-কম্বল সম্বল করে বেরিয়ে পড়েন মুক্ত অম্বরতলে। অভিমুখ শ্রীক্ষেত্র। সঙ্গে কয়েকজন শিষ্যমাত্র। যাঁরা গুরুসঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হননি।

সাধু বালকরামদাস চলেছেন শিষ্য সমভিব্যহারে। শোভাযাত্রায় শিষ্যরা বাজাচ্ছেন বাদ্য। তাঁরা উপস্থিত হলেন দিল্লীর প্রান্তসীমায়। দিল্লী তখন মুসলমান বাদশাহের শাসনাধীনে। একদল হিন্দু সাধু বাজনা বাজিয়ে তাঁর রাজ্য দিয়ে যাবে। এ অসহ্য। আদেশ দিলেন বালকরামকে বন্দী করতে।

হাতে পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখা হল বালকরামকে করাগারে। বন্দীশালায় নির্যাতন ভোগ করেও কোন দুঃখ বা কষ্ট নেই মনে তাঁর। শিষ্যরা কিন্তু বেদনাসিক্ত।

চারদিন পর বালকরাম কারাগার রক্ষীদের মাধ্যমে বাদশার কাছে বার্তা পাঠায়—কেন তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি বিদেশী। কোন বিদেশীকে বিনা অপরাধে দণ্ড দেওয়া চলে না। এতে ভগবান রুষ্ট হন। বাদশা যদি তাঁকে মুক্ত করে দেন, তিনি তাঁকে রহম দিয়ে চলে যাবেন। না হলে তিনি প্রভুর ক্ষমতা দেখবেন। রাজ্য তলিয়ে যাবে জলের তলায়

বাদশা বালকরামের বার্তা শুনে বিদ্রুপের সুরে বললেন—তাই নাকি। দেখি তার ক্ষমতা।

রক্ষীরা বাদশার মর্জির কথা জানাল। এবার বালকরামের শরীর থেকে নামল জলের ধারা। সে ধারার সঙ্গে দেখতে দেখতে আরও জলের ধারা মাটি ফুঁড়ে বেরোতে থাকে। দিল্লী ডুবে যায় হাঁটু সমান জলে। প্রমাদ গণেন বাদশা। রাজ্যবাসীদের বাঁচাবার জন্য বালকরামের কাছে কৃতকর্মের জন্য মাপ চায় ও শৃঙ্খলমুক্ত করে দেয় তাঁকে।

বন্দী জীবন হতে মুক্ত হয়ে বালকরাম পা বাড়ান শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে। বাদশা তাঁর সঙ্গ দেন রাজ্যের প্রান্ত সীমা পর্যন্ত। যাওয়ার আগে বালকরামের স্পর্শে বাদশার জীবন হতে হারিয়ে যায় সমস্ত ক্লেদ, অভিমান, অহঙ্কার। তাঁরও জীবন ভরে উঠেছে স্বর্ণদীপ্তিতে।

বারবার সেলাম জানিয়ে বলে—দরবেশ সাহাব, এ দিল্লী আপনার রইল। আমি কেবল আপনার বান্দা রূপে এর দেখভাল করবো।

—সূত্র ঃ ওড়িয়া ভক্তমাল

হিন্দু ধর্মে গণতান্ত্রিকতার পরম্পরা

রবীন সেনগুপ্ত

পৃথিবী সহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডেই চিরকাল একটিই ধর্ম রয়েছে। সে ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম। তাকেই হিন্দুধর্ম বলা হয়। অন্য যেগুলিকে ধর্ম বলা হয় সেগুলি আসলে হলো সম্প্রদায়। সকল সম্প্রদায়ই এই সনাতন হিন্দু ধর্মের অংশ। প্রতিটি সম্প্রদায়ই সনাতন হিন্দু ধর্মের বহু দিকের মধ্যে কয়েকটি পছন্দ মতো দিক পালন করে থাকে এবং বাকি দিকগুলিকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে বা পালন করতে সক্ষম হয় না। যেমন ইসলাম একটা সম্প্রদায়। সেই সম্প্রদায় সনাতন হিন্দু ধর্ম থেকে নিরাকার আরাধনা, হাঁঠুমুড়ে প্রার্থনা, উপবাস, দান, তীর্থ সেবা ও উৎসবটা নিয়েছে। বাকি সবকে অস্বীকার করেছে। ইসলামে আল্লা ছাড়া আর কারও গান গাওয়া হারাম, ছবি আঁকা হারাম, নৃত্য ও অভিনয়ও হারাম, মূর্তি পূজাও হারাম। অথচ গণতান্ত্রিকতার ঐতিহ্য অনুসারে হিন্দু ধর্মে রয়েছে। ১। নিরাকার আরাধনা ২। সাকার বা মূর্তি সহযোগে আরাধনা ৩। গুরু পূজা ৪। দেশমাতার সেবা করা ৫। ধ্যান ৬। কীর্তন ৭। প্রাণায়াম ৮। সংগীত চর্চা ৯। নাট্য চর্চা ১০। নৃত্য চর্চা ১১। চিত্র ও ভাস্কর্য চর্চা ১২। সংসার ধর্ম পালন ১৩। সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাস গ্রহণ ১৪। কর্মযোগ ১৫। জ্ঞানযোগ ১৬। জ্যোতিষ চর্চা ১৭। যোগাসন ১৮। আমিষ আহার পূর্বক ধর্মচর্চা ১৯। আমিষ আহার ত্যাগ পূর্বক ধর্মচর্চা ২০। সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতি করা ২১। দান করা ২২। তীর্থ সেবা ২৩। সাধু সেবা ২৪। পিতামাতাকে সেবা ২৫। শিক্ষকতা ২৬। চিকিৎসা পরিষেবা দান, ২৭। প্রযুক্তিবিদ্যা পরিষেবা দান ২৮। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ২৯। পরিবেশ সুরক্ষা ৩০। পশু পাখি সংরক্ষণ ৩১। কৃষি ৩২। গো-রক্ষা ৩৩। বাণিজ্য ৩৪। শ্রাদ্ধ কর্ম ৩৫। জলাশয় খনন ৩৬। পথ নির্মাণ ৩৭। প্রশাসনে অংশ গ্রহণ ২৮। শাস্ত্র পাঠ ৩৯। শাস্ত্র প্রচার ৪০। শুদ্ধ প্রেম ভালবাসার চর্চা ৪১। মন্দির নির্মাণ ৪২। বিদ্যালয় নির্মাণ ৪৩। অনাথ আশ্রম নির্মাণ ৪৪। ভিক্ষা গ্রহণ ৪৫। অহিংস ভাবের চর্চা ৪৬। ক্ষেত্র বিশেষে পশু বলিদান ৪৭। বস্ত্র ত্যাগ পূর্বক আধ্যাত্মিক পর্যটকের জীবন গ্রহণ ৪৮। দীক্ষা দান ও দীক্ষা গ্রহণ ৪৯। উপবীতগ্রহণ ৫০। ঠাকুরের আরতি পূজা ইত্যাদি দর্শন, প্রসাদ বিতরণ ও প্রসাদ গ্রহণ।

এই বহুসংখ্যক বিপরীত মত ও পথের দিশা একমাত্র হিন্দু ধর্মেই রয়েছে। বৈষ্ণব শৈব, শাক্ত এগুলিও সম্প্রদায়। তবে অন্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যেকের বিশাল পার্থক্যটা হল এই যে এই তিনটি সম্প্রদায় অনাদিকাল থেকেই রয়েছে এবং তারা সনাতন ধর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা এই এতগুলি সনাতন মার্গের সবকিছু গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যেমন পশু বলি নিষিদ্ধ, শাক্ত সম্প্রদায়ে আবার পশু বলি রয়েছে। শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক তিন প্রকার ভাবধারাই রয়েছে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মুখ্যত রয়েছে সাত্ত্বিক ভাবধারা।

খৃষ্টান বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের মত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী, মর্ডান আর্টিস্ট, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সেকুলার দল এগুলিও এক একটি সম্প্রদায়। এদের কারোরই হিন্দু ধর্মের মতো পূর্ণতা নেই। এরা মানুষের কাজ, যুক্তিতর্ক, রাজনীতি, গবেষণা ও সৃজনশীল, ধ্যান, যোগাসন, প্রাণায়াম এসব করেন। কিন্তু তীর্থসেবা, সাধুসঙ্গ, শ্রাদ্ধ, দীক্ষা গ্রহণ, আত্মা-সূক্ষ্মদেহ, পুনর্জন্ম এসবকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মান্য করেন না। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম সব কিছুকেই মান্য করে। বিপরীত ধারার নানা মতবাদ হিন্দু ধর্মে সসম্মানে স্বীকৃত। সর্বভূতেই ব্রহ্ম। কিছুই ব্রহ্মের বাইরে নয়। হিন্দুরা ব্রহ্ম নিরাকার একথা মানে। আবার প্রতিমার মাঝেও তাঁর প্রকাশকে মানে। প্রতিমাকে আর্ট বলে মানে। প্রতিমা পূজাকে কালচার বলে মানে। ইসলামের মতো এসবকে পৌত্তলিক বলে ঘৃণা করতে ও ভেঙ্গে ফেলতে শেখায় না। বৌদ্ধ জৈনরা একাধারে মূর্তিকে অস্বীকার করেও পরে বুদ্ধ দেব ও জৈনের মূর্তি গড়ে পূজা করতে বাধ্য হয়েছে। খৃস্টানরাও গডকে নিরাকার বলেও বাইবেলের ছবিতে মূর্তিধারী গড বিশ্বদৃষ্টি করছেন এরকম ছবি আঁকতে বাধ্য হয়েছে। যীশু ও মাতা মেরীর মূর্তি গড়ে প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়েছে। যুক্তিবাদী সম্প্রদায়রাও যোগ, প্রাণায়াম, নিরামিষ আহার, জ্যোতিষ, মন্ত্র, স্তোত্রকে প্রথমে অবজ্ঞা করে পরে অনেক ক্ষেত্রেই এগুলিকে কম-বেশি মেনে নিতে ও ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। এখানেই হিন্দু ধর্মের জয়। বর্তমানে হিন্দুকেও যে একটা সম্প্রদায় বলে মনে করা হয়, সেটা মস্ত বড় ভ্রান্তি।

গণতন্ত্র মানে মানুষের সুবিধা, পারিবারিক ঐতিহ্য, জন্মগত প্রবণতা অনুযায়ী একাধিক বিকল্পের মধ্য দিয়ে কোনও কিছুকে বেছে নেওয়া। যেমন হিন্দুরা তাদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী আরাধনার জন্য নিরাকার ব্রহ্ম, রাধাকৃষ্ণ, শিব-দুর্গা, মা কালী, গণেশ, রামচন্দ্র, হনুমান ইত্যাদির মধ্যে থেকে কাউকে বেছে নিতে পারে। কিন্তু মুসলমানরা তা পারে না। তাদের এক নিরাকার আল্লা ও হজরত ছাড়া আর কাউকে মান্যতা দান বা উপাসনা করা নিষিদ্ধ। খৃস্টানরাও তা পারে না। সেখানেও গড ও যীশু ছাড়া কোনও বিকল্প নেই। বৌদ্ধ রাও তা পারে না। সেখানে বুদ্ধ দেব ছাড়া শীর্ষে কেউ নেই। বিজ্ঞানীরাও তা পারেন না। বিজ্ঞানে যুক্তি প্রমাণের বাইরে কিছু নেই। আধ্যাত্মিক ভিন্ন মাত্রার অনুভূতি যুক্তিবাদে গ্রাহ্য নয়। চার্বাক, ডাঃ কাভুর বা প্রবীর ঘোষরা তাই একটা সীমার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন না। হিন্দুরা পারে। কারণ, হিন্দুর ধারণায় সীমার মাঝে অসীম তিনি। শুধু যুক্তি তথ্য নয়, এর বাইরেও উপলব্ধির এক বিশাল জগত আছে, যার সন্ধান ইসলাম, খৃস্টান পায় না। যদি পেতে চায়, তাদের পথে পায় না তারা। তাদের সেই বেদ-বেদান্তর আশ্রয় নিতে হয়। তাই কোরান, বাইবেল ইতিহাস সাহিত্য বিজ্ঞানের নানা স্থানে হিন্দু ধর্ম, হিন্দুর পূজা, অবতারবাদ, ধ্যানজপকে চরম অবজ্ঞা ও অস্বীকার করেও আটকানো যায়নি। বহু মুসলিম, খৃস্টান, সেকুলারী ছুটে এসেছেন যুগযুগান্ত ধরে কৃষ্ণ কীর্তনের আসরে, গীতার বাণীর আশ্রয়ে, প্রাণায়াম ও ধ্যান শিক্ষার কেন্দ্রে, দুর্গা-কালী ও গণেশ পূজার আসরে। ভবিষ্যতেও এই ভাবেই আসতে থাকবেন তারা। না এসে উপায় কি? উৎসকে ছেড়ে মানুষ থাকবে কি করে? হৃদয়ের টান উলঙ্ঘন করবে কি করে মানুষ? জন্মগত ভাবে সবাই তো হিন্দু হয়েই জন্মায়, তারপর সুন্নৎ করে তাকে মুসলিম বানানো হয়, বিশেষ পদ্ধ তিতে তাকে খৃস্টান করা হয়। ভুল যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তাকে সেকুলারী বানানো হয়। এগুলি সব আরোপিত সম্প্রদায়। অরিজিনালি সবাই সনাতন ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত।

তানাজী মালসুরে

কর্তব্যনিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে শ্রীগুরুজী অনেক সময়-ই তানাজী মালসুরের আত্মবলিদানের কথা বলতেন। মহারাষ্ট্রে কোণ্ডানা নামে এক প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। তখন ওই দুর্গটি মোগলদের অধীনে ছিল। একবার মাতা জীজাবাঈ ওই দুর্গটি জয় করার বিষয়ে

পুত্র শিবাজীকে বললেন। ব্যাস্‌। তখনই শিবাজী দুর্গ জয় করবেন বলে ঠিক করে ফেললেন।

কিন্তু কোণ্ডানা দুর্গ অত্যন্ত দুর্গম স্থানে ছিল। তা জয় করা মোটেই সহজ ছিল না। শিবাজী ভাবতে লাগলেন, কে এই দুর্গ জয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে? তখনই তার মনে পড়ে গেল একান্ত সহযোগী তানাজী মালসুরে-র নাম। তানাজী সবরকম বিপদ মোকাবিলা করেও উদ্দেশ্যে সফল হতেন।

শিবাজী তানাজীকে ডেকে পাঠাতে কাউকে পাঠাবেন ভাবছিলেন এমন সময় তানাজী নিজেই ছেলে রাঘোবার বিয়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে শিবাজীর কাছে হাজির হলেন। শিবাজী ভাবলেন, তানাজী ছেলের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত সেজন্য নিজেই যাবেন কোণ্ডানা দুর্গ জয় করতে। কিন্তু তানাজীই শিবাজী মহারাজকে বললেন, রাঘোবার বিয়ে পরে হবে। আগে কোণ্ডানা দুর্গ জয় করতে হবে।

তানাজী ছেলের বিয়ে স্থগিত করে গভীর রাত্রে কোণ্ডানা দুর্গ আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ হল মোগলদের সঙ্গে।

দুর্গজয় সম্পূর্ণ হলেও তানাজী নিজে নিহত হলেন। তখন শিবাজী বললেন, গড় (দুর্গ) এল কিন্তু সিংহই চলে গেল। তানাজীর স্মৃতিতে দুর্গের নাম রাখা হল সিংহগড়। পরে শিবাজী ধুমধাম করে রাঘোবার বিয়ে দিলেন। ব্যক্তিগত আনন্দ উৎসবের থেকে রাষ্ট্র-স্বার্থকেই প্রাধান্য দিতেন তানাজী। তানাজী সকলের কাছে প্রেরণাস্থল। বর্তমানে সিংহগড়ে রয়েছে তাঁর আবক্ষ ব্রোঞ্জমূর্তি।

।। চিত্রকথা।। শ্রেষ্ঠ শিষ্য একলব্য।। ২।।

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

ধরা পড়বে জিন-ডোপিং

কৃত্রিমভাবে পারফরম্যান্স বাড়াতে অ্যাথলিটরা নানাবিধ ওষুধের সাহায্যে ডোপ করতেন। কিন্তু ডোপ-পরীক্ষায় কড়াকড়ি চালু হওয়ার ফলে এখন অনেকে জিন-ডোপিংয়ের সাহায্য নিচ্ছেন। সম্প্রতি জার্মানির কোলনের স্পোর্টস্‌ ইউনিভার্সিটির দাবী, তাঁরা জিন-ডোপিং ধারার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। এর জন্য তাঁরা মাস স্পেক্ট্রোমি ব্যবহার করছেন। খবরটি পেয়ে ওয়ার্ল্ড্‌ অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি উচ্ছ্বসিত।

*　　*　　*

মস্তিষ্কের ক্ষতিকারক প্লাস্টিক

পলিকার্বনেট প্লাস্টিকের অন্যতম রাসায়নিক উপাদান বিসফেনল-এ বা বিপি-এ মানবদেহে অনুপ্রবেশের ফলে মস্তিষ্কের প্রভূত ক্ষতি করা ছাড়াও হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, অ্যালঝাইমার্স, হতাশা ইত্যাদি বহু রোগের কারণ হতে পারে। প্লাস্টিক নরম করতে ব্যবহার করা হয় রাসায়নিক Phthalates যা দেহে অনুপ্রবেশ ঘটলে গর্ভস্থ শিশুকে আক্রান্ত করতে পারে। কারণ হতে পারে শুক্রাশয়ে ক্যানসারের। শতকরা ১৭ জনের শুক্রাণু-হ্রাসের কারণ হিসেবে রাসায়নিকটিকে দায়ী করেছেন বিজ্ঞানীরা। প্লাস্টিকজাত দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহারে প্রতিটি মানুষকেই সচেতন হতে হবে।

*　　*　　*

চশমা নিজেই পাওয়ার বদলাবে

চোখের ডাক্তারের সাহায্য ছাড়াই চশমা এবার নিজেই পাওয়ার বদলে নেবে। এই অভিনব চশমাটি তৈরি করেছেন ব্রিটিশ-বিজ্ঞানী জোওয়া সিলভার। তিনি আশা করেন, আগামী দশ বছরের মধ্যে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের চোখে উঠবে এই চশমা। ওই চশমার কাচগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যিনি পরবেন, তাঁর চোখের সুবিধে অনুযায়ী টিউনড্‌ হয়ে যাবে। চশমার লেন্স তৈরি হয়েছে মোটা প্লাস্টিক দিয়ে, যার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের তরল পদার্থ।

*　　*　　*

শিশুর ব্লাডপ্রেসার

ইদানীং কচি-কাঁচাদের মধ্যেও উচ্চ রক্তচাপ জনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর জন্য দায়ী করা হচ্ছে দীর্ঘক্ষণ ধরে টি ভি দেখা, ভিডিও গেম খেলা, কম্পিউটারে কাজ করা। মাদ্রিদের ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন, বাচ্চাদের অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে তাদের কায়িক পরিশ্রম কমে যায় এবং তারা মোটা হতে থাকে। যদিও উচ্চরক্তচাপের সঙ্গে জেনেটিক কারণ যুক্ত বা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে খাদ্যাভ্যাস, ঘুমের অভ্যেস ইত্যাদি। তবুও সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার ঠিক রাখতে কখনও একটানা টিভি বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকা উচিৎ নয়।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

রীতা—মাউন্ট এভারেস্ট-এ গাছপালা এত কম কেন রে?

নীতা—অত উঁচুতে উঠে রোজ রোজ গাছে জল দেওয়া যায় না তো, তাই!

*　　*　　*

সঙ্গীত শিক্ষক—সঙ্গীতের কোন্‌ তালটি তোমার বেশি পছন্দ?

শিক্ষার্থী—হরতাল।

*　　*　　*

প্রশ্ন—হরপ্পার মতো প্রাচীন সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেল কেন?

উত্তর—হরপ্পার মেয়েরা বন্ধ্যা ছিল কিনা!

*　　*　　*

শিক্ষক—পানিপথের যুদ্ধ কেন হয়েছিল বল।

ছাত্র—স্যার, স্থলপথে নিশ্চয় কিছু অসুবিধে ছিল, তাই।

*　　*　　*

এক অনুষ্ঠানে একটি ছোট্ট মেয়ে রবীন্দ্রনাথের দিকে অটোগ্রাফের খাতাটি এগিয়ে দিতেই কবি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

—আমার নাম ছবি।

তখন রবীন্দ্রনাথ অটোগ্রাফের খাতায় লিখলেন, 'তোমার নাম ছবি,
আমার নাম রবি
মিলে কবিতা, বেঁচে গেল কবি।'

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। টিনটিন কমিক্সে স্নোয়ি কী ধরনের প্রাণী একদম পছন্দ করত না?

২। ১৯০০ সালের অলিম্পিকে কোন্‌ খেলায় বেসরকারিভাবে পাখি ব্যবহার করা হয়?

৩। 'আই এন এস শিবালিক' ভারতের ডুবোজাহাজ না যুদ্ধ-জাহাজ?

৪। কমলালেবুতে পাওয়া যায় ভিটামিন সি। এর আর এক নাম কী?

৫। 'দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপ্‌স' নামে বিখ্যাত গল্পটি কার লেখা?

—নীলাদ্রি

উত্তর :

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। যুদ্ধ জাহাজ

৪। অ্যাসকরবিক অ্যাসিড

৫। স্যার আর্থার কোনান-ডয়েল

আদমসুমারীর প্রক্রিয়া শুরু
জনগণনার নতুন গাইডলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আগামী বছর সারা দেশে আবার নতুন করে জনগণনার প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে। যতদূর জানতে পারা গিয়েছে, দু'রকম তথ্য সংগ্রহ করা হবে। বাসগৃহের তালিকা ছাড়াও জাতীয় নাগরিক সূচী বা ন্যাশান্যাল পপুলেশন রেজিস্টার তৈরি করা হবে। সেই সূচীতে দেশের প্রতিটি পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণও থাকবে। জনগণনা-কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে ২৩টি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করবেন। তার মধ্যে নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ধর্ম, পেশা, জন্মস্থান, আয়, সম্পদ ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য থাকবে। এসবই প্রথম পর্যায়ে। পরের পর্যায়ে হবে প্রকৃত জনগণনার তথ্য সংগ্রহ। ২০১১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কর্মীরা পুনরায় বাড়ি বাড়ি যাবেন।

এবারের জনগণনা বা আদমসুমারি অনেক বেশি তথ্যে সমৃদ্ধ হবে। দেশের উন্নয়নে এসকল তথ্য কাজে লাগবে। কেন্দ্র সরকার এবার যে জাতীয় নাগরিক সূচী তৈরি করছে তার ফলে প্রতিটি নাগরিকের তথ্য সরকারের কাজে সঞ্চি ত থাকবে। এবং ১৮ বছর ও তদূর্দ্ধ নাগরিকদের প্রত্যেককে সরকারের পক্ষ থেকে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অফ্ ইন্ডিয়া'—বলে নির্দিষ্ট কার্ড দেওয়া হবে। এই আসন্ন জনগণনার কাজে ইউনিসফেও সাহায্য করবে।

তপশীলি জাতি ও জনজাতিদের তথ্য পৃথকভাবে নেওয়া হবে। তবে ও বি সি-দের তথ্য আলাদাভাবে নেওয়া হবে না বলে জানা গেছে। এবারই প্রথম প্রতিবন্ধীদের তথ্য পৃথকভাবে সংগৃহীত হবে। জনগণনা কর্মীরা কারও বাড়িতে গিয়ে যদি কোনও বিদেশীকে বা অন্য দেশের কোনও নাগরিককে দেখেন তাহলে সেই তথ্যও সংগ্রহে রাখার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

সারা পৃথিবীতেই জনগণনা একটি প্রাচীন প্রক্রিয়া। সম্ভবত যীশুখৃস্টের সময় থেকেই এই পদ্ধতি চালু হয়ে থাকতে পারে। জনগণনা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উন্নয়নের বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করে থাকে। জনসংখ্যার ভিত্তিতেই বিশ্বজুড়ে উন্নতির কম-বেশী হিসাব করা হয়। জনগণনার কাজ শিক্ষকরা করবেন। এ ব্যাপারে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে। ব্যাপক পরিকল্পনায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নিখুঁতভাবে সবকিছু পরিচালনা করবেন। জেলাশাসকরা হবেন প্রিন্সিপ্যাল সেনশাস অফিসার, এ ডি এম-রা হবেন ডিস্ট্রিক্ট সেনশাস অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট স্যাটিসটিক্যাল অফিসাররা হবেন ডেপুটি ডিস্ট্রিক্ট সেনশাস অফিসার, এস ডি ও-রা হবেন মহকুমা জনগণনা আধিকারিক। বি ডি ও-রা হবেন চার্জ সেনশাস অফিসার আর পুরপরিষদের চীফ্ এক্সিকিউটিভ অফিসারও বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন।

বর্ধমান সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে র প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো সরস্বতী শিশুমন্দিরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রধান অতিথির ভাষণে বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা স্বপ্না সিনহা বলেন, আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে বলে প্রচারের আলোতে তুলে ধরে আমরা আনন্দে আত্মহারা হচ্ছি। কিন্তু তার ফলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের দৈন্যতাও যথেষ্ট বেশী পরিমাণে প্রকট হচ্ছে। শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা নেওয়ার মধ্যে এক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। সনাতন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে বিষয়গুলিকে যুগপোযোগী করে শিক্ষা দানই শিক্ষার সঠিক পথ বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সরস্বতী শিশু মন্দিরের শিক্ষা পদ্ধতি সেই পথ ধরেই হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পুষ্পাঞ্জলি ও মাতৃবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন প্রধানাচার্য সুনীল রায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু ভাইবোনেরা নৃত্যগীত, নাটক অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করে। শিশুমন্দিরের পক্ষ থেকে অন্যতম কার্যকর্তা অসিত রায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'র সম্মেলন

সংবাদদাতা ঃ আগামী ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বর পূর্ব এবং পূর্বোত্তর ক্ষেত্রের রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি'র কার্যকর্ত্রী সম্মেলন কলকাতার বিনানী ধর্মশালায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমিতির দ্বিতীয় প্রমুখ সঞ্চ ালিকা বন্দনীয়া সরস্বতী তাঈ আপ্টের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই সম্মেলন। ২৫ ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রণব কন্যা আশ্রমের সহ-সভানেত্রী সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দময়ী মা। ২৬ ডিসেম্বর বিকেল তিনটায় পথ-সঞ্চ লন। সমিতির অখিল ভারতীয় বৌদ্ধি ক প্রমুখ শরদ রেণু এবং সহ-বৌদ্ধি ক প্রমুখ সুলভা দেশপাণ্ডে সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

তপন সিংহের কাহিনী ও চিত্রনাট্য নিয়ে রাজা সেনের ছবি 'তিনমূর্ত্তি'

বিকাশ ভট্টাচার্য

একজন ৯২ বছরের বৃদ্ধ 'স্কাই-ডাইভ' দিতে গিয়ে, পা ভেঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে যদি হেসে উঠতে পারে এই ভেবে যে সে অদ্ভুত কিছু একটা করতে পেয়েছে, তবে অবসরপ্রাপ্ত সত্তর পার হওয়া তিনবন্ধু কেন চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে সকাল বিকেল শুধু চর্বিত চর্বন

রঙ্গম

করে যাবে? সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত 'তিনমূর্ত্তি' ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য এই বিষয়েই গড়ে তুলেছিলেন তপন সিংহ। তিন বৃদ্ধের চরিত্রের জন্য অর্থাৎ নবীন, নগেন আর নরেনের ভূমিকায় তাঁর বহু ছবির অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে আর মনোজ মিত্রকে ভেবেও রেখেছিলেন। কিন্তু শেষদিকে অসুস্থতার জন্যে আর শুটিং শুরু করতে পারেননি। আর শেষপর্যন্ত তো তিনি চলেই গেলেন।

তপন সিংহ তাঁর প্রথম ছবি অঙ্কুশ (১৯৫৩) থেকেই স্টার সিস্টেমের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করে, সুরুচির সঙ্গে বাণিজ্যধারার মেলবন্ধন ঘটিয়ে একের পর এক বৈচিত্র্যময় ছবি করে গেছেন। তাঁর প্রায় প্রতিটি ছবিই দর্শক সমাদৃত। রসোত্তীর্ণ। আর তাই বোধহয় তথাকথিত ইনটেলেকচুয়েলরা সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের সঙ্গে এক নিঃশ্বাসে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে দ্বিধা করত। তাঁর 'কাবুলিওয়ালা' (১৯৫৭), শুধু রাষ্ট্রপতি পুরস্কারই নয়, বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উচ্চপ্রশংসিত হয়ে পুরস্কৃতও হয়েছে। 'অতিথি' (১৯৬৫) ছবি থেকেই নিজের ছবির মিউজিক নিজেই করা শুরু করেছিলেন। 'তিনমূর্ত্তি' ছবির মিউজিকও তাঁরই করা। ছবির একটি গান 'ফুল করবী ঘোমটা খোল' তাঁর লেখা।

তপন সিংহের মৃত্যুর পর তাঁরই ঘরানার শিষ্যসদৃশ পরিচালক রাজা সেন এগিয়ে এলেন ছবিটি সম্পূর্ণ করতে। চিত্রনাট্য সংযোজন ও সম্পূরণ করলেন মনোজ মিত্র। বিশিষ্ট প্রযোজক আর. এ. জালান ও ভরত জালানরা এগিয়ে এসে প্রযোজনার দায়িত্ব নিলেন। ইতিমধ্যে অসুস্থতার কারণে দীর্ঘকালীন চিকিৎসার জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চলে গেছেন বিলেত। তাই

'দেবী' - পাওলি দাম

নবীনের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এগিয়ে এলেন রঞ্জিত মল্লিক। শেষপর্যন্ত তপন সিংহের অসমাপ্ত ছবি তাঁর উত্তরসূরীদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ হয়ে আজ দর্শকদের সামনে।

'তিনমূর্ত্তি' তিনজন প্রবীণ বন্ধুর গল্প— সমস্ত জীবন আন্তরিক দায়িত্বে রোজগার করে সংসার প্রতিপালনের পর যারা এখন জীবন সায়াহ্নে অবসরের মুখ দেখেছে, এই ব্যস্ত প্রজন্মের শহরে। একাকীত্ব আছে...আছে প্রত্যাশা আর কখনো-সখনো বঞ্চনাও— নিজেদের সন্তান অথবা সন্তানতুল্য উত্তর প্রজন্মের কাছ থেকে। এদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা কেউ থাকে বিদেশে অথবা কেউ থাকে পৃথক। তাই এরা আঁকড়ে ধরে অসহায় বিধবার মেয়ে দেবী আর গ্রাম থেকে শহরে আসা মৃন্ময়কে। নবীন মৃন্ময়কে স্বেচ্ছায় কিছু টাকা দিয়েছিল লেকে একটা চায়ের দোকান খোলার জন্য। তোলাবাজ রামদুলাল আর স্থানীয় দুষ্কৃতীদের দাপটে যে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। তিন প্রবীণ চ্যালেঞ্জটা নেয়।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, এ.জি.বেঙ্গলের অবসরপ্রাপ্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর রিটায়ার্ড স্টেশন মাস্টার মিলে চায়ের দোকানটা আবার চালু করে। হাসি ঠাট্টা আর হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত উদ্যমী এই অদ্ভুত কাণ্ড করা তিনমূর্ত্তি দেখতে দেখতে মাস খানেকের মধ্যেই দোকানটাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের জীবনের সেকেণ্ড ইনিংসটা শুরু হয়ে যায়। প্রবীণদের এই উৎসাহ দেখে বিমর্ষ মৃন্ময় একটা টিউটোরিয়াল খোলার কথা ভাবে, তার পাশে এসে দাঁড়ায় দেবী। তিনমূর্ত্তি বলে, ক্ষেত্রটা ছোট হয়ে গেলেও লড়াইটা ছোট হয়ে যায় না।

তিন প্রৌঢ়ের ভূমিকায় রঞ্জিত, দীপঙ্কর ও মনোজ এককথায় অপূর্ব, সঙ্গে সঙ্গত করে গেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের কথাবার্তা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজই বলে দেয় শরীর বুড়ো হয় না। বুড়ো হয় মন। মনটাকে সতত সৃজনশীল রাখতে পারলে একাকীত্ব, বঞ্চনা, রোগজ্বালা সব যেন দূরে সরে যায়। তপন সিংহ সব সময় তাঁর ছবির মধ্যে দিয়ে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার কথাই বলেছেন। তাঁর 'গল্প হলেও সত্যি'ও আমাদের জীবনকে নতুন করে চিনতে শিখিয়েছিল।

পরিচালক রাজা সেন একনিষ্ঠভাবে চিত্রনাট্য অনুসরণ করেছেন। ছবি তরতর করে এগিয়ে গেছে। দেবীর ভূমিকায় পাওলি দাম সুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁর পাশে মৃন্ময়ের ভূমিকায় জয় মুখার্জী বড়ই নিষ্প্রাণ। কৌতুকাভিনেতা শুভাশীষ মুখার্জী করেছেন তোলাবাজের অভিনয়। তাঁর অভিনয়ে অন্য এক মাত্রা তিনি আনতে পেরেছেন। চিত্রগ্রহণে রাণা দাশগুপ্ত এবং সম্পাদনায় অর্ঘ্যকমল মিত্র তাঁদের সুনাম রাখতে পেরেছেন। কাজী নজরুলের একটি বহুশ্রুত শ্যামাসঙ্গীত 'কালো মেয়ের পায়ের তলায়' ছবিতে সমবেত কণ্ঠে ব্যবহৃত হয়েছে। সুপ্রযুক্ত। 'তিনমূর্ত্তি' ছবির জন্য পরিচালক রাজা সেন অবশ্যই প্রশংসা পাবেন।

শব্দরূপ - ৫৩০

শ্রেয়সী হরি

১	■	■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■	৬	৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮		৯	■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. পৌরাণিক এক ব্রহ্মর্ষি, শেষ দুয়ে বন্ধু, ৪. বিষ্ণু ও শিবের অভেদমূর্তি, ৬. লোকমান্য বাল গঙ্গাধর এর পদবি, ৮. নদী বিশেষ, অন্ধকার, ১০. বিশেষ দেহজাত, শেষ দুয়ে ধূলা, ১২. অন্য নামে বুদ্ধ দেব, তৃতীয় ও চতুর্থ খোপে ঋষি।

উপর-নীচ ঃ ১. বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার, প্রথম দুয়ে শুকর, ২. একই শব্দে বৌদ্ধ মঠ, ভ্রমণ বা বিচরণ, ভারতের পূর্বাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য বিশেষ, ৩. বিনীত প্রার্থনা বা নিবেদন, ৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দে বৃষ্টির শব্দ বা নূপুরের শব্দ, ৭. বেহুলার স্বামী, ৯. ঈশ্বরের একলোকে বাসরূপ মুক্তিবিশেষ, পঞ্চ বিধ মুক্তির অন্যতম, ১০. দুর্যোধনের কূটবুদ্ধি সম্পন্ন মাতুল, ১১. মিথিলার রাজা।

সমাধান শব্দরূপ - ৫২৮

সঠিক উত্তরদাতা

অসীম দে
সাহাপুর, মালদহ
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

হ	■	অ	ঞ্জ	না	■	ব	■
র	■	নি	■	র	সা	ল	■
পা	তা	ল	■	দ	■	রা	■
র্ব	■	■	■	■	গা	ম	ছা
তী	ব	র	■	■	■	■	গ
■	ন	■	বি	■	স	র	মা
■	বি	রা	ট	■	রো	■	ং
■	বি	■	প	ষ্ক	জ	■	স

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৩০ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ জানুয়ারী, ২০১০ সংখ্যায়

বিশ্ব-বিদ্যার আলয়, না বিশ্ববিদ্যা লয় ?

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুম্ করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রেসিডেন্সী কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রমোশন দেওয়া হবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর 'Do it now' নীতি-অনুসারে দেরী না করে অবিলম্বেই।

বছর বারো আগে প্রেসিডেন্সী কলেজকে স্বশাসিত কলেজে রূপান্তরিত করতে সরকার খুব ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। সে সময় যারা এই সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন, এখন স্বশাসনের পরিবর্তে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হলেও সেসব বক্তব্যের যৌক্তিকতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ আড়াই শতাধিক কলেজের মধ্যে মাত্র একটি কলেজের প্রতি সরকারি কর্তৃপক্ষের এই পক্ষপাত কেন? ওটা কি সুয়োরাণী? আর বাকী সব দুয়ো? কলকাতায় তো 'বিগ ফাইভ' অর্থাৎ বৃহৎ পাঁচটি কলেজে গোষ্ঠী বর্তমান আছে। বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ (ভগবান এঁদের আত্মার শান্তিবিধান করুন!), সিটি ও বঙ্গবাসী কলেজ এবং কলকাতার বাইরে নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ তো একমাত্র ছাত্রসংখ্যার জোরেই স্বশাসন দাবী করতে পারে। বিদ্বজ্জনেরা সঙ্গত প্রশ্নই তুলেছেন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থেকে প্রেসিডেন্সীর কি অসুবিধা হচ্ছে? স্বশাসনের সপক্ষে যে তিনটি কারণ তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলি জোরালো তো নয়ই, বরং দুর্বল এবং জোলো বলেই ঠেকে। নিজেদের পাঠ্যক্রম তৈরি, ছাত্রভর্তির ব্যাপারে স্বয়ংকৃত নিয়মকানুন এবং নিজেদের মতো করে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা—শুধু এই তিনটি ক্ষমতার অভাবেই কি প্রেসিডেন্সী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম পজিশন থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে অবনমিত হয়েছে? আর এসব ক্ষেত্রে স্বাধিকার পেলেই কি প্রেসিডেন্সী তরতরিয়ে হৃতগৌরব ও মর্যাদার মগডালে উঠে যাবে? ডিম্‌ড ইউনিভার্সিটি নামে যে আজব বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে, সেগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে কি এমন সোনার ডিম্ব প্রসব করেছে যে, প্রেসিডেন্সীও সে সোনার হরিণের পেছনে ছোটার তাগিদ অনুভব করছে?

প্রেসিডেন্সী কলেজের জন্য যদি আলাদা পাঠ্যক্রম তৈরী করতে হয়, তাহলে সব কয়টা সরকারি কলেজের পাঠ্যক্রম একই ছাঁচে ঢালা হোক। কৌলীন্য-তিলক শুধু প্রেসিডেন্সীর কপালেই পরানো হবে কেন? এসব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রেসিডেন্সী নয়, সরকার সব কয়টা সরকারি কলেজ নিয়েই চিন্তাভাবনা করতে পারে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গের সব কয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে সমতা আনা ও সামঞ্জস্য বিধানের কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। একই রাজ্যে দশটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দশ ধরনের গ্র্যাজুয়েট ও দশ ধরনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছে। পাঠ্যক্রমে কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। সব বিশ্ববিদ্যালয়ই এখন সরকারের খাস তালুক। কারো কোনও স্বাতন্ত্র্য নেই, স্বকীয়তা নেই। সরকারই উদ্যোগ নিয়ে যদি এদের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে সামঞ্জস্য বিধান করে, তবে পঠনপাঠন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়নে কিছুটা সমতা আসবে। তাতে ছাত্র ছাত্রীরা উপকৃত হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের মধ্যে অদল- বদল করে উত্তরপত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা হলে ছাত্রছাত্রীরা অনিশ্চিত ফলের আশঙ্কায় লেখাপড়ার প্রতি বেশী আন্তরিক ও আগ্রহী হবে বলেই বিশ্বাস।

প্রেসিডেন্সী কলেজ

পশ্চিমবঙ্গে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠনপাঠনে যে নিদারুণ অবনতি ঘটেছে গত ক'বছরে প্রকাশিত 'স্লেট' পরীক্ষার ফলেই তার প্রকাশ। সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক পর্যায় থেকে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ভাষা শিক্ষা নিয়ে যে অবৈজ্ঞানিক ও অবিজ্ঞোচিত পরীক্ষা নিরীক্ষা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চলছে, তার কুফল ফলতে শুরু করেছে। এসব অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের পরিপূর্ণ মূল্যায়নের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে বিহারের ছাত্রদের সমতায় এসে গেছে, বাংলাতেও তাদের জ্ঞানের বহর দিন দিন খাটো হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা পড়ান, তাঁরাই খাতা দেখেন, প্রশ্নপত্র তৈরী করেন। অনেক অধ্যাপকের বিরুদ্ধেই পক্ষপাতিত্ব ও নানাবিধ দুর্নীতি ও অনাচারের অভিযোগ ওঠে। নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া, পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ না করা, পরীক্ষার আগে বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রীকে প্রশ্নপত্রের আভাস দেওয়া, উত্তরপত্র পরীক্ষাকালে কারো কারো প্রতি নেকনজর—ইত্যাদি অনিয়ম বেনিয়ম ছাত্ররা মুখ বুঁজে সহ্য করে। যেহেতু তাদের মরণ-বাঁচন অধ্যাপকদের হাতে। যাঁরা কর্তব্যনিষ্ঠ নীতিনিষ্ঠ ও ছাত্রহিতৈষী তাদের কথা আলাদা। কিন্তু 'ডাল মে কালা'র সংখ্যা দিনদিনই বাড়ছে। তা না হলে স্লেট, নেট প্রভৃতি পরীক্ষায় এ রকম শোচনীয় ফল কেন?

কার্যত যে কোনও পরীক্ষাতেই নির্ভেজাল পাসের হার শতকরা পঁচিশ/ ত্রিশের বেশী নয়। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তুকি, গোঁজ ও (ডিস্) গ্রেস মার্ক দিয়ে শতকরা হার পঞ্চাশোর্ধ্বে তোলা হয়। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তো অনুগ্রহ বিতরণের অবাধ ক্ষমতা অধ্যাপকের হাতে। সুতরাং সেখানে দুধে জলের পরিমাণ আরও বেশী। কিন্তু 'জেট' 'স্লেট' 'গেইট' প্রভৃতি পরীক্ষায় যেহেতু সম্পূর্ণ কোর্সের উপর প্রশ্নপত্র তৈরী হয়—এম. এ. এম. এস. সি. ও এম. কম.'-এর মতো প্রতি পত্রে আট-দশটা আভাসিত প্রশ্নের উপর পরীক্ষা হয় না, তাই পরীক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হলে চোখে সরষে ফুল দেখে। আর শোঁকাশুকির মতো মুখ কাছে না থাকায় পরীক্ষকও নির্ভেজাল নম্বরই প্রদান করেন। ফলং—শতকরা পঞ্চান্ন ও ততোধিক নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীদের পাশের হার শতকরা দশ মাত্র। কি বিড়ম্বনা!

প্রেসিডেন্সীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলে উপরোক্ত অধিব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে কি? বিশ্ববিদ্যালয় তো কলেজগুলির অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে কোনই হস্তক্ষেপ করে না—যদি না কোনও গর্হিত অনিয়ম ঘটে। প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যবস্তু নির্ধারণ, ভর্তির তারিখ স্থিরকরণ, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি সীমাবদ্ধ। আর সর্ব বিষয়েই কলেজগুলি স্বরাট স্বাধীন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছে কলেজগুলি বছরে ২০০ দিন খোলা থাকবে এবং অধ্যাপকগণ সপ্তাহে অন্তত ২৪টি ক্লাস নেবেন। সে নিয়ম কয়টি কলেজ নিষ্ঠাভরে পালন করে? পালিত হলে কি এমন শোচনীয় ফল ফলত? বছর বছর হাজার হাজার দড়কাঁচা গ্র্যাজুয়েট উৎপাদন হতো? বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগগুলি সম্পর্কেও একই বক্তব্য। নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ না করে কয়েকটি সাজেসান্ ও নোট-এর উপর ভর করে গায়ে ফার্স্ট ক্লাসের আদ্দির পাঞ্জাবী চাপালে কি হবে, কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেটা নেহাতই ছেঁড়াফোঁড়া ফতুয়া। চোতা কাগজ বাজারে বিকালো না। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বশাসনের স্লোগান তোলার পেছনে কারো কারো সুপ্ত বাসনা কাজ করছে না তো। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে বের হয়ে গেলেই ওই আদলে একজন করে মিনি উপাচার্য, মিনি রেজিষ্ট্রার, মিনি কন্ট্রোলার, মিনি ফিনান্স অফিসার পদ তৈরি হবে। গণ্ডাগণ্ডা ছোট বড় মেজ-সেজ করণিক পদ সৃষ্টি হবে। সেগুলি পূর্ণ করতে ভাইপো ভাগ্নে কন্যা বধূমাতারা এসে আসনের শোভা বর্ধন করবে। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় যথাপূর্বং তথা পরং। এ ধরনের স্বশাসনে প্রশাসনের গলদ দূর হবার কোনও সম্ভাবনা আছে কি? নেই তো বটেই, এবং থাকবেও না।

মার্ক্সীয় জ্যোতিষশাস্ত্র

সুমিত চক্রবর্তী

সি পি এম-এর মুখ্যমন্ত্রী কমরেড বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে ক্রনিক ব্যারামে ভুগছেন, তাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে 'ফুট ইন মাউথ'। অতি পুরাতন বাত ব্যাধির মতই অমাবস্যা-পূর্ণিমায় এবং নানা তিথি-অতিথিতে এটি হঠাৎ চাগাড় দিয়ে ওঠে। একযুগেরও বেশী আগেকার সেই বিখ্যাত সু-উক্তি (বেদের ভাষায় সূক্ত বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত) 'চোরেদের ক্যাবিনেট' থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ ঐতিহাসিক উক্তি 'আই ডোন্ট বিলিভ এ্যাস্ট্রোনমি ইজ এ সাইন্স দো মেনি সে ইট ইজ' ইত্যাদি মহাবাক্যগুলিকে আশা করি পশ্চিমবাংলার 'কমরেড জণগণ' স্মরণে রাখবেন। পরেই অবশ্য তিনি জানিয়েছেন যে 'এ্যাস্ট্রোনমি' বলতে 'এ্যাস্ট্রোলজি'ই বুঝতে হবে। আসলে তিনি যা বলেন নি, তা হল : খাঁটি 'স্ট্যালিনিস্ট রেজিম'এ এই রকম সাদা-সাপটা ভাষায় 'কোদাল'কে 'কোদাল' বলা মার্ক্সবাদ-সম্মত নয়। এমন কি অ-মার্ক্সীয় ঘোর হিন্দুরাও কখনও কানা-কে কানা বা খোঁড়া-কে খোঁড়া বলে না। তা'তে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি মনে আঘাত পেতে পারেন। কাজেই এ্যাস্ট্রোলজিকেও এ্যাস্ট্রোলজি বলা উচিত নয়। শিবঠাকুরের আপন দেশে (অর্থাৎ অধুনালুপ্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে) একটি প্রবাদবাক্য চালু ছিল—'ইউ সেইড দ্যাট ইউ ওয়্যার গোয়িং টু মিন্স্ক, সো আই থট ইউ ওয়্যার গোয়িং টু পিন্স্ক। বাট ইট কম্প্লিটলি ডিসিভড মি বাই গোয়িং টু মিন্স্ক।' অর্থাৎ হাওড়ায় যাচ্ছি বলে ঘোষণা করলে রাণাঘাট যাওয়াটাই মার্ক্সবাদ সম্মত। মার্ক্সবাদে সঠিকভাবে শিক্ষিত জনগণ জানতেন, 'মিনস্ক' বললে সর্বদা 'পিনস্ক'ই বুঝে নিতে হবে। মিনস্ক-এ যাব বলে কেউ যদি মিনস্কেই যায় তা হলে সুশিক্ষিত জনগণ বিভ্রান্ত হতেই পারেন। এইটিই মার্ক্সীয় সত্য। পশ্চিমবাংলার কমরেডদের প্রথম থেকেই এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে এ্যাস্ট্রোনমি বললে সর্বদা এ্যাস্ট্রোলজিই বুঝতে হবে। অ-শিক্ষিত পাবলিক ভুল বুঝলে মুখ্যমন্ত্রী নাচার। তিনি নৈতিক দায় স্বীকার করে বলতেই পারেন, 'জনগণকে বোঝাতে পারিনি।'

মেনেই নেওয়া গেল, এ্যাস্ট্রোনমি মানে এ্যাস্ট্রোলজি—অর্থাৎ জ্যোতির্বিদা নয়, জ্যোতিষশাস্ত্র। কিন্তু বিষয়টি ঠিক কি? খায়, না মাথায় দেয়? প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রকারেরা জ্যোতিষশাস্ত্রকে তিনটি মুখ্য অংশে ভাগ করেছিলেন, যার জন্য একে বলা হত ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষ। তিনটি স্কন্ধ হল : ১. গণিত জ্যোতিষ যা বর্তমান এ্যাস্ট্রোনমির সমার্থক। এর আলোচ্য বিষয় হল মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতিবিধি। ২. ফলিত জ্যোতিষ—যে শাস্ত্রে জাতকের (ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত বা সমগ্র দেশের) উপরে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ গণনা করা হয় এবং ৩. সংহিতা জ্যোতিষ, যার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। মানব সমাজের এমন কোন বিষয় নেই যা এই শাস্ত্রে আলোচিত না হয়। এটি জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ হলেও রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পকলা, স্থাপত্যবিদ্যা, নন্দনতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, কৃষি, আবহাওয়া বিজ্ঞান ইত্যাদি মানবসমাজের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ই এর পরিধির অন্তর্গত। অনেক পণ্ডিতই সংহিতা জ্যোতিষকে সমাজ-বিজ্ঞানের (Social Science) একটি শাখা বলে বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

প্রাচীন জ্যোতিষী বরাহমিহির জ্যোতিষশাস্ত্রের তিনটি স্কন্ধের উপরেই গ্রন্থ রচনা করেছেন : ১. গণিত জ্যোতিষের উপরে 'পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা' ২. ফলিত জ্যোতিষের উপরে 'বৃহজ্জাতক' ৩. সংহিতা জ্যোতিষের উপরে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা'। এই সকল গ্রন্থেই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর পূর্বসূরী ঋষি এবং জ্যোতিষীদের নাম, যাঁদের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করেছেন। বেদ এবং মহাভারতের কালে বৃদ্ধ গর্গ, গর্গ, পরাশর এবং আরও অনেকের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা এই শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন এবং গবেষণা করেছেন। বরাহমিহির বলেছেন, যে দেশে সুশিক্ষিত এবং উপযুক্ত জ্যোতিষীর অভাব আছে, সে দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য।

আর পাঁচজন গোলা পাবলিকের মত অধম কলমচীরও মুশকিল হল, গণিত এবং ফলিত উভয় জ্যোতিষেই তার জ্ঞান প্রায় শূন্য। সক্রেটিসের মতই তার এটুকু জ্ঞান হয়েছে যে সে এ বিষয়ে প্রায় কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও ঝাপসা অ-কমরেডীয় বুদ্ধিতে যে বিষয়টি তার কাছে নিতান্তই গোলমেলে মনে হয় সেটি হল—পরাশর, গর্গ, বৃদ্ধ গর্গ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির থেকে আরম্ভ করে ভাস্করাচার্য ইত্যাদি সকল দিকপাল এ্যাস্ট্রোনমারই এ্যাস্ট্রোলজিও চর্চা করতেন কেন? 'বিজ্ঞানসম্মত' কমরেডদের মত তাঁরাও এ্যাস্ট্রোনমি বললে এ্যাস্ট্রোলজি বুঝতেন কি না সেটি তার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। ইউরোপীয় ইতিহাসে দেখা যায় সুপ্রাচীন কাল থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্যন্ত সে দেশের জ্যোতির্বিদেরা—এমন কি টলেমি, গ্যালিলিও, কেপলার, টাইকো ব্রাহের মত বিখ্যাতরাও—জ্যোতিষশাস্ত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। গ্যলিলিও (১৫৬৪-১৬৪২) রীতিমতো পেশাদার জ্যোতিষী ছিলেন। বহু বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর কাছে আসতেন ভবিষ্যৎ গণনা এবং জন্মকুণ্ডলী তৈরি করবার জন্য। তাঁর রচিত কিছু জন্মকুণ্ডলী এখনও বর্তমান। বহুকাল ধরে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গভীর বিশ্বাস ছিল, স্বয়ং আইজ্যাক নিউটনও (১৬৪২-১৭২৭) নিয়মিত জ্যোতিষচর্চা করতেন, যদিও পরবর্তী গবেষণায় তা প্রমাণিত হয়নি।

হবুচন্দ্র রাজার দেশে একটি বিচিত্র নিয়ম আছে। যিনি যে বিষয়টি যত কম জানেন, সে বিষয়ে ফতোয়া দেওয়ার অধিকার তাঁর ততটাই বেশী। গোলা পাবলিকের মনে হতেই পারে, যিনি যে বিষয়টি নিয়ে কোন চর্চাই করেননি, তিনি সে বিষয়ে এমন বেমক্কা মন্তব্য করবেন কেন? 'বিজ্ঞানসম্মত' মার্ক্সবাদ এবং 'অপ-বিজ্ঞান' বা 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' জ্যোতিষের মধ্যে একটি মিল বড়ই অস্বস্তিকর। উভয় শাস্ত্রই দাবী করে, নিজ নিজ বিদ্যার দ্বারা মানব-সমাজের আবর্তন, বিবর্তন, উদ্বর্তন, পরিবর্তন সহ সকল ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা অভ্রান্তভাবে গণনা করা সম্ভব। বিগত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস যদি দেখা যায় (অবশ্য এর বেশীর ভাগ সময়েই 'মার্ক্সবাদ' এর কোন অস্তিত্বই ছিল না), তা হলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভবিষ্যৎ গণনার ব্যাপারে মার্ক্সবাদের তুলনায় জ্যোতিষের 'ট্র্যাক-রেকর্ড' অনেক অনেক ভাল। গোলা পাবলিকের এমনটাও মনে হতে পারে যে উভয় বিদ্যার কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার পরে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী মানুষের তুলনায় জ্যোতিষে বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যাও এখন অনেকটাই বেশী। মহাপৃথিবী মার্ক্সবাদকে সম্পূর্ণ ভুলবার আগে বোধ হয় ভেবে দেখবার সময় হয়েছে (বা হয় তো অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে) যে 'বিজ্ঞানসম্মত' এবং 'সর্বশক্তিমান' মার্ক্সবাদী জ্যোতিষীরা নিজেদের নিশ্চিত অবলুপ্তির বিষয়টি তাঁদের ভবিষ্যৎ গণনায় বুঝতে পারলেন না কেন।

Swastika
21 December - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

একান্ত সাক্ষাৎকারে ডাঃ ইন্দ্রনীল বসুরায়

‘হিন্দু দর্শনকে আধার করেই রচিত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান’

একদা ছাত্র বয়সে স্বস্তিকা দপ্তরে এসে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যদি কোনও দিন আমেরিকায় যান তবে পড়াতেই যাবেন, পড়তে নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম ডি (ডক্টর অব্ মেডিসিন) সেই ছেলেটি আজ সত্যিই ওখানে পড়াচ্ছেন। প্রথমে হার্ভার্ড থ্রনডাইক ইলেকট্রোফিজিওলজি ইনস্টিটিউটের ইনভাসিভ কার্ডিয়াক ইলেকট্রোফিজিওলজি রিসার্চ সেন্টারের ডিরেক্টর ছিলেন। বর্তমানে বাফেলো-র সানি-তে পড়াচ্ছেন মেডিসিনের ওপর। ‘কথা রাখা’ এই ব্যক্তির নাম ইন্দ্রনীল বসুরায়। তাই কলকাতা এলেই অতীতের স্মৃতি হাতড়ে একবার ঢুঁ মেরে যাবেনই স্বস্তিকায়। এবারও এসেছিলেন। অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের কাছে তিনি ‘হ্যালো ভি আই পি’ কিংবা ‘ব্যস্ত সেলিব্রিটি’। কিন্তু স্বস্তিকায় তিনি বরাবরই ‘ঘরের ছেলে’। ভারতীয় ঐতিহ্য আর পতঞ্জলি যোগসূত্রে ভর দিয়ে সুদূর আমেরিকায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংজ্ঞাটাকেই পাল্টে দেওয়া সেই ইন্দ্রনীল বসু রায়ের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় স্বস্তিকার প্রতিনিধি অর্ণব নাগ।

❑ প্রথমেই জানতে চাইব, হিন্দু দর্শনকে আশ্রয় করে আমেরিকাতে আপনি যে বিরাট কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন তার সম্বন্ধে কিছু বলুন।

● প্রথমেই বলি আমরা আমেরিকায় বেদান্ত টুডে ইনকরপোরেশান নামে একটি অলাভদায়ক সংস্থা খুলেছি যেখানে পেশাদার এবং দার্শনিকরা তাদের আরব্ধ গবেষণার কাজ করতে পারবেন। বিশ্বের ছ'টি মহাদেশের ১০৩টি দেশে 'বেদান্ত টুডে' নিরন্তর কাজ করে চলেছে মানুষকে শান্তি দিতে, শক্তিশালী করতে এবং এসবই হচ্ছে যোগ-ধ্যানের মাধ্যমে যাতে করে মানুষ সুস্থ জীবন-যাপন করতে পারেন। এছাড়া বেশ কিছু চিকিৎসা কেন্দ্র যেমন কেসওয়েস্টার্ন, ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তো আছেই, তাছাড়া মায়ো ক্লিনিক—এ সমস্ত জায়গায় বিজ্ঞান ও মেডিটেশান নিয়ে আমাদের লোকেরা কাজ করছেন। এছাড়া ওয়ার্কশপের মাধ্যমে যোগ ও ধ্যানের সুফল বিস্তারিতভাবে অবগত করানোরও চেষ্টা করছি আমরা।

❑ বেদান্ত টুডে'র সম্পাদক তো আপনিই?

● হ্যাঁ, আমি Editor in Chief। আমাদের একটা ওয়েবসাইট রয়েছে। www.vedantatoday. com এবং আমাদের ই-মেল অ্যাড্রেস info @ vedantatoday. com। স্বস্তিকার পাঠকরা আমাদের সাথে এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতেই পারেন।

❑ পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করার লোভ কিছুতেই সংবরণ করা যাচ্ছে না। আমাকে বলুন, আমেরিকার মতো একটা সফিস্টিকেটেড জায়গা, সেখানে তাদেরকে আপনি বলছেন যোগের মাধ্যমে রোগ সারাতে, এতে তাদের মর্ডানিটি আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে না?

● (হাসি) হচ্ছে না তো! বরঞ্চ আগে আমরা কোনও রকম সরকারি সাহায্যই পেতাম না কিন্তু এখন গবেষণার কাজে আমেরিকার ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অব্ হেলথ-এর অনুদান আমরা পাচ্ছি।

❑ নিঃসন্দেহে ইন্টারেস্টিং তথ্য। যাই হোক, যোগ বা ধ্যানের মাধ্যমে রোগ সারানোর ব্যাপারে কি বলছেন?

● বলার আগে বহু পুরনো একটা ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলি। ৮০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দে ভারতের পূর্ব উপকূলে শঙ্করগড়ে করম্ভ নামে এক ভদ্রলোক বাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন দুঃখী মানুষ। কারণ তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত ছেলে-মেয়েরা করম্ভ-এর কৃপণ স্বভাবের জন্য তাকে পরিত্যাগ করে। খিটখিটে হয়ে যাওয়া করম্ভ শেষ পর্যন্ত গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং শেষে মারা যায়। এই গল্পটা বলার উদ্দেশ্য একটাই। কারণ এর মধ্যে যে তাৎপর্য নিহিত রয়েছে তা হলো করম্ভের মানসিক অবসাদ একটা সময় চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেটা প্রাথমিকভাবে তার অসুস্থতা ও পরে মৃত্যুর কারণ হয়।

আমি ঠিক এই জায়গাটাই ধরতে চাইছি। মন আর দেহের মধ্যে যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তা কিন্তু গল্পটা থেকে পুরোপুরি ধরতে পারা যাচ্ছে। চরক ও সুশ্রুতের মতো প্রাচীন ভারতের চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারকারীগণ কিন্তু এই-ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছিলেন। অধিকাংশ প্রাচীন দর্শন-ই এবিষয়ে একমত যে মন ও দেহের গভীর যোগাযোগের জন্যই মনের অবস্থার ওপর মানুষের শারীরিক অবস্থা পুরোপুরি নির্ভর করে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে আমরা যার নাম দিয়েছি সাইকোম্যাটিক ইলনেস। পশ্চিমী ওষুধপত্র এখনও সেই চিরাচরিত ধ্যান-ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে দেহ ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগের জন্য যে সকল জৈবিক ক্রিয়া-কলাপ সংঘটিত হচ্ছে তা শুধু মস্তিষ্কের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। পশ্চিমী দেশগুলিতে মন (mind) সম্পর্কে যে ধারণা রয়েছে অর্থাৎ তা হলো বিমূর্ত সত্তা (abstract entity)—এটা অস্পষ্ট ও ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত।

❑ এ বিষয়ে আপনার বিজ্ঞান কি ব্যাখ্যা দিচ্ছে?

● মন ও দেহ-এদের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে গেলে মন-এর তথাকথিত একটা প্রভাব এবং এর কতগুলো প্রেক্ষিত যেমন ধরো মেজাজ (mood) এগুলো ভাল করে আগে বুঝতে হবে। যদি কেউ খুশী মেজাজে থাকেন তবে নিশ্চিতভাবেই তার দেহের ইমিউনো সিস্টেম (রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা) খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে। এখানে বলে রাখা দরকার যে মেলাটোনিন, মেট এনকেফেলিনের মতোন দেহের অভ্যন্তরে কিছু রাসায়নিক পদার্থ, দেহে ইমিউনো সিস্টেমে মদত যোগায়। টি (থাইমাস) সেল এবং এন কে (ন্যাচারাল কিলার) সেল সরাসরি ক্যান্সার ও ভাইরাস আক্রান্ত দেহের কোষগুলির ধ্বংস সাধন করে। বহু পরীক্ষার পর এটা এখন প্রমাণিত যে মন-মেজাজ ভাল থাকলে ওই রাসায়নিক পদার্থগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। যে কারণে হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের সাইকো-ইমিউনোলজিক্যাল গবেষণা প্রকল্পের আওতাভুক্ত দু'শোরও বেশি ক্যান্সার চিকিৎসা হয়েছে এই "দেহ/মন" (mind-body) তত্ত্বের ভিত্তিতে।

❑ এর ওপরে হিন্দু দর্শনের কতটা প্রভাব রয়েছে?

● এই তত্ত্বগুলো পুরোটাই তো হিন্দু-দর্শনকে আধার করে রচিত হয়েছে। এই তত্ত্বে আয়ুর্বেদের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ আয়ুর্বেদের ওপর পরিবেশের একটা প্রভাব তো রয়েছেই। এবং মানব-মনের ওপর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা কিন্তু অপরিবর্তনীয় ভাবেই পরিবর্তিত (invariable translated) হয়ে যায় মানবশরীরে। ২০০২ সালে ল্যান্সেট জানিয়েছিলেন উজ্জ্বল আলো মস্তিষ্কের সেরাটোনিন বৃদ্ধি করে, যেখানে রাত্রি বা মেঘলাদিন সেরাটোনিন মাত্রা হ্রাস করে। এগুলোও কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, হিন্দু দর্শনের প্রভাব চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কতটা প্রভাবিত করেছে।

❑ রোগ-প্রতিরোধে প্রাণায়াম বা মেডিটেশনের ভূমিকা কতটা?

● মেডিক্যাল জার্নাল স্বীকার করেই নিয়েছে যে অ্যাজমা (একধরনের শ্বাসকষ্ট) প্রতিরোধে প্রাণায়ামের কোনও বিকল্প নেই। ব্যাপকহারে অপব্যবহার করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো ক্যানানবিসের হুবহু বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ আমাদের মস্তিষ্কে এল কি করে? বহু গবেষণার পর যেটুকু জানা গেছে তা হলো প্রথমে যখন এই রাসায়নিকটি ব্যবহৃত হয় তখন এর নাম ছিল আনন্দমাইড। অবশ্যই এই কথাটা সংস্কৃত শব্দ 'আনন্দ' থেকে এসেছে। মেডিটেশান যখন রক্তে আর ব্লাড প্রেসার যেটাকে টেকনিক্যালি হাইপারটেনশন বলা হয় তা আটকাতে মেডিটেশনের কোনও বিকল্প নেই। ১৯৯২ সালে একটা বিস্ময়কর আবিষ্কার হয়। মস্তিষ্কের মধ্যে একটি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যার বৈশিষ্ট্য ক্যাননবিস নামক একটি ড্রাগ-এর অনুরূপ। এই ক্যানানবিস ড্রাগটিকে কিন্তু আনন্দমাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয় তখন হাইপারটেনশনের দূরতম সম্ভাবনাটুকুও থাকে বলে মনে হয় না।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব এখনও আমেরিকায় কতটা পরিলক্ষিত হচ্ছে?

● প্রত্যক্ষ প্রভাব হয়তো কিছুটা কম। তবে যে সব কর্মকাণ্ড তিনি আমেরিকায় চালু করেছিলেন তা এখনও খুব মসৃণভাবে চলছে। তিনিই তো প্রথম ওখানে বলেছিলেন—আমাদের ধর্ম সায়েন্টিফিক, ইমোশানাল নয়। তবে এটাও ঠিক এই জন্যেই এখানে স্বামীজি-কে নিয়ে একটা অপব্যবহারের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। যেমন ধরো, কারুর হয়তো যোগ-ধ্যান সম্পর্কে বিন্দুমাত্র 'আইডিয়া' নেই, সেই-ই দেখা গেল পয়সা রোজগারের জন্য একটা স্টুডিও খুলে বসে গেছে!

❑ আমেরিকার মানুষকে যেটা আপনি এত সহজে বোঝাতে পারছেন, সেই জিনিসটা ভারতের মানুষকে বোঝাতে পারবেন?

● চেষ্টা তো করব। আমি ইতিমধ্যেই আই আই টি, আই আই এম, আই এস আই-এর মতো 'ইন্টেলেক্ট' জায়গাগুলোতে যোগাযোগ করেছি এনিয়ে।

❑ এটা খুব আশ্চর্য লাগে – যে শিক্ষার শিকড় নিহিত ভারতবর্ষে, অথচ সেখানকার মানুষরা এর কদর করছেন না, এর সমাদর করছেন সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের মানুষজন! এর জন্য কি মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার অভাব নাকি দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা—কোনটাকে দায়ী করবেন?

● প্রথমত, রাজনৈতিক নেতাদের সদিচ্ছা তো নেই-ই। দ্বিতীয়ত, জনশিক্ষার হারটাও এখানে খুব কম। আমার কেবলই মনে হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন কালচারকে অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা উল্টোদিকে ছুটছি।

❑ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

● ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।

প্রকাশিত হবে ২৮ ডিসেম্বর '০৯ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ২৮ ডিসেম্বর '০৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে চলছে রাষ্ট্রপুঞ্জের পঞ্চদশতম জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন। এই সম্মেলনের লক্ষ্য, গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠেকাতে কার্বন নির্গমন হ্রাসের মাত্রা ও তার দরুন আর্থিক বন্দোবস্ত স্থির করা। আর এই স্থির করতে গিয়েই চলছে ১৯২টি দেশের কূটনীতির লড়াই। যে লড়াইয়ে অংশীদার ভারতও। সেইসমস্ত খবরাখবর নিয়েই আগামী সংখ্যার আকর্ষণ—কোপেনহেগেন শিখর সম্মেলন।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম ত্রর ..... পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com